ISSN 2319-2151

Quest

Uluberia College
Uluberia, Howrah-711315

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasih Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Dipak Kumar Nath, Sm. Chandana Samanta
Dr. Uttam Purkait,Dr. Momotaj begam.

Advisory Committee

Dr. Urvi Mukhopadhyaya,
Dept. of History, W.B. State University,
Dr. Biswajit Choudhury,
Dept. of applied Chemistry, Indian School of Mines.
Prof. Supriyo Bhattacharya,
Dept. of Economics, Kalyani University,
Dr. Manidipa Sanyal,
Dept. of Philosophy, Calcutta University,
Dr. Chanchal Dasgupta,
Dept. of Life Science and Biotechnology,
Jadavpur University

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

Vol-8, 2013-14

Printed by :

IMPRESSION
108, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata 700 029
Phone : 2463 4916

Quest

A Bi-lingual Academic Journal
2013-14

Vol-8

Uluberia college
Uluberia, Howrah-711315

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

সূচীপত্র

Part -I

(প্রথম ভাগঃ)

1)	সুপ্রিয় ভট্টাচার্য	শিক্ষাব্রতী স্যার আশুতোষ	1
2)	বাসন্তী ভট্টাচার্য	উপেন্দ্র কিশোর ও সন্দেশ	9
3)	ডঃ মমতাজ বেগম	নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল, স্বাদেশিকতা ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	13
4)	ডঃ মীরাতুন নাহার	এক অপরাজিত দেশনায়ক	22
5)	ডঃ অদিতি ভট্টাচার্য	সুকুমার রায় ও আবোল তাবোল	30
6)	ডঃ চিত্রিতা দত্ত	কথাসাহিত্যিক কমলকুমার ঃ নানা সমালোচকের চোখে	36
7)	ডঃ উত্তম পুরকাইত	ছোটগল্পকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ	48

Part -II

(দ্বিতীয় ভাগ)

1)	ডঃ শুভময় ঘোষ	'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে তরঙ্গিণী চরিত্র	69
2)	Dr. Jayasree Sarkar	Abul Fazl 'Allami' in Mughal India : His Thoughts & Writings	74
3)	Soma Mondal	Money, Marriage and Jane Austen	81

4)	Dr. Lopamudra Das	Sylvia Plath's Delineation of Motherhood	87
5)	সুপ্রিয় ধর	সাহিত্যে পারাপার 'প্রসঙ্গ জীবনানন্দ	97
6)	Dr. Aditi Bhattacharya	Time in Relation to Human Consciousness	104
7)	জয়জিৎ মণ্ডল	ভয়ঙ্কর সমুদ্র দানব	115
8)	তরুণ কুমার সামন্ত	পাণ্ডুলিপির ইতিকথা	124
9)	Dr. Bireswar Mukherjee	A review of Polymer & Bioplastics	131
10)	Dr. Supatra Sen	Silent Witnesses : Palynology in Crime	137

87

97

104

115

124

131

137

Editorial

This is the ninth issue of our academic journal. Stimulating and encouraging feedback from different academic quarters, sincere effort of the faculty members and their valuable contributions have made possible to publish this yearly journal uninterruptedly. Two years back it has been registered under ISSN and this year with the consent of our Editorial Board we have formed an Advisory Committee by roping in a few scholars of different disciplines from renowned institutions.

Like the previous two years this year also one part of our journal is devoted to commemorate some of the stalwarts of our country in different fields. We are celebrating the 150th Birth Anniversary of the great Educationist Sir Ashutosh Mukhopadhyaya, the Litterateurs like Upendrakishore Roy and Dwijendralal Roy; 125th Birth anniversary of the legendary writer Sukumar Roy and the great Political Thinker Moulana Abul Kalam Ajad; the Birth Centenary of two other Litterateurs Sri Kamal kumar Majumdar and Adwaita Mallabarman. The other part of the Journal is as usual devoted to the academic writings of the faculty members.

We welcome our reader's criticisms to assess and improve the academic zeal of our writings.

TABLE 2

Part -I

(প্রথম ভাগ)

Part - I

(Civil Law)

Our homage to
Sri Ashutosh Mukhopadhya,
Upendra Kishore Roychoudhuri
and
Diwijendralal Roy
in their 150th Birth Anniversary

অন্তর্জিত রা

ভারতবাস হ
কারনটিকে
করবার শ
অনেকের
কল্পনা, অ
তাদের সম
বুঝতে গে
একদিকে
হিসেবে।
বিচার পরি
বিদ্যায় তাঁ
তাঁর যে উ
পরিচালিত
হিসেবে অ
সেটা অনু
আর বক্ত
তখন ব্র
গোলামখা
গেলেন না
করলেন ই
কিভাবে ভ
বিশ্ববিদ্যাল
আশুতোষে

আমন্ত্রিত রচনা

শিক্ষাব্রতী স্যার আশুতোষ

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য,
অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এক

দ্বারভাঙ্গা হলে যেদিন স্যার আশুতোষের প্রস্তর মূর্তি উন্মোচিত হয়, সেদিন বাংলার লাট কারমাইকেল সাহেব বলেছিলেন "কোনো একটা জিনিসকে বিরাট কল্পনায় আয়ত্ত করবার শক্তি আশুতোষের আছে, কিন্তু সেই কল্পনা কাজে পরিণত করবার শক্তি অনেকের নেই, আশুতোষের তাও আছে।" একই সঙ্গে কবি ও সাধকের মত বিরাট কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি, অন্যদিকে মহাকর্মীর বিপুল কর্ম-কুশলতা — এই দুই গুণের সমন্বয়ে স্যার আশুতোষ আবির্ভূত হয়েছিলেন—এই বাঙলায়। তাঁর অবদানকে বুঝতে গেলে যে কালে তিনি কাজ করেছেন, সেই কালটিকে আমাদের বুঝতে হবে। একদিকে দেখছি ছোটবেলা থেকেই তিনি অসামান্য প্রতিভাবান গণিত ও বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। এই প্রতিভার বলে তিনি শীঘ্রই উত্তীর্ণ হন কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির পদে এবং সেখানে দীর্ঘকাল অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু বিধাতা তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন সারস্বত অঙ্গনে মহানায়কের ভূমিকায়। জজ হিসেবে তাঁর যে তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বাগ্মিতা, তা অচিরেই কাজে লাগবে ইংরেজ সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ যাত্রায়। দু'দফায় উপাচার্য হিসেবে আপন আধিপত্য কায়েম করেন স্যার আশুতোষ। কাজটি যে সহজ ছিল না, সেটা অনুমেয়। কিন্তু আশুতোষের বাধা ছিল শুধু ইংরেজ সরকার নয়, বাধা ছিল স্বদেশী আর বয়কট আন্দোলন, অসহযোগ আর আইন অমান্য। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত দেশপ্রেমিকেরা মনে করেছেন ইংরেজের গোলামখানা এবং তা 'চূর্ণ' করে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ, আশুতোষ সে পথে গেলেন না । নিয়ম না ভেঙে, প্রতিষ্ঠানকে বর্জন না করে তার মধ্য দিয়েই তিনি চেষ্টা করলেন ইংরেজ মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শিক্ষার বিস্তার কিভাবে করা যায় এবং কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার পথকে প্রশস্ত করা যায়। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ের ভূমিকা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে নতুন যুগে আশুতোষের ভূমিকার তাৎপর্য।

দুই

১৮৫৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পঠন-পাঠন হত শুধু কলেজগুলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল শুধু সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষ-গ্রহণ, আর ডিগ্রি দেওয়া। সংস্কৃত আর ফার্সি ছাড়া ভারতচর্চার সুযোগ প্রায় ছিল না। সেকালের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী শুধু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, ইংরেজি রুচি, মতাদর্শ আর নীতিবোধ লালন করে পাকা ইংরেজিয়ানা ছিল জীবনাদর্শ। পড়ানো হত মূলত গণিত, তর্কবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, কাব্য, দর্শন ও পদার্থবিদ্যার বিষয়গুলি। এই রকম পরিস্থিতিতে স্যার আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের মূল বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করবার সঙ্কল্প নিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি পৃথিবীর সর্বজাতিকে ডাক দিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে। এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে শুধু পাশ্চাত্য বিদ্যার নয়, হবে প্রাচ্য বিদ্যারও মহাকেন্দ্র, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। অভাব অভিযোগ দ্বেষ- হিংসা ও নানা অন্তরায়কে অগ্রাহ্য করে তিনি অগ্রসর হলেন।

১৯২১-২৩, যখন দ্বিতীয় দফায় তিনি উপাচার্য, তখন চালু করলেন বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর পাঠক্রম। অল্প সময়ের জন্য হলেও তাঁর অনুরোধে বাঙলার হেড-এগজামিনার হতে রাজি হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চালু হল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস আর সংস্কৃতির পাশাপাশি স্থান করে নিলেন অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল, শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর। সেই সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার (Indian vernaculars) চর্চাও শুরু হল মহা উদ্যমে। শুরু হল ইসলামিক বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার এবং পালি ভাষার চর্চা। দেশ-বিদেশের অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন স্যার আশুতোষ প্রাচীন কীর্তি-উদ্ধার ও প্রাচ্যভাষার অনুশীলনের জন্য। কে না এসেছেন এখানে তাঁর আমন্ত্রণে — রাশিয়ার স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক পল-ভিনোগ্রেডফ্, ফরাসি প্রাচ্য বিদ্যার শিরোমণি সিলভ্যাঁ লেভি, জামার্নির ভিন্টার- নিৎস ও ওল্ডেনবার্গ, বিলেতের প্রাচ্য বিদ্যার কল্পতরু গিলবার্ট টমাস ওয়াকার, সুবিখ্যাত ম্যাকডোনেল, এন্ড্রু রাসেল ফরাসিথ, — হেনরি আর্ম-স্ট্রং, জার্মান পণ্ডিত জেকবি, ডঃ থিবো, আর্থার স্যুসটার এবং আরো কত পণ্ডিত। অধ্যাপকদের মধ্যে জাপানি, চৈনিক, দ্রাবিড়ী, সিংহলী, মারহাট্টা, টিবেটান প্রভৃতি। সেই সঙ্গে শত শত ভুর্জপত্র, প্রাচীন কাগজে লিখিত পুঁথি, জাপানি পুঁথি, ৭০০০ বাংলা প্রাচীন পুঁথি, দ্বারভাঙা হলে স্থান পেয়েছিল। এছাড়া অসংখ্য বিরল বহুমূল্য গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ; ইজিপ্টের প্রাচীন মূর্তির ছবি, কত দেশের মানচিত্র, দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি কত যে সংগ্রহ করেছিলেন ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য, তার ইয়ত্তা নেই।

তিন

শুধু এই নয়। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, তাঁর চেষ্টাতেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে উচ্চমানের গবেষনার গোড়াপত্তন করে। সরকারি শৃঙ্খলের মধ্যে থেকেও আশুতোষ উচ্চশিক্ষায় ভবিষ্যৎ পঠন-পাঠন ও গবেষণার পথ মুক্ত করে দেন নানা বেসরকারি অনুদান সংগ্রহ করে, সেই সঙ্গে বিখ্যাত ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল অর্থ-দাক্ষিণ্য যোগাড় করে। তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ- এঁদের মত দুঁদে আইনজীবি এবং আরো কিছু শ্রুতকীর্তি ব্যক্তির আর্থিক বদান্যতায় তৈরী হয় বিজ্ঞানের প্রফেসর পদগুলি। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খয়রার রাজার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দান, নির্মলেন্দু ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থ গিরিশবাবুর বিপুল অর্থ, খনি-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বহুমূল্য সম্পত্তি দান, ভোলানাথ বক্সুয়ার দশ হাজার টাকা, মৈথিলী ভাষার গবেষণার জন্য রাজা কীর্তনিন্দ সিংহের অর্থ, মৈমনসিংহ সেরপুরের জমিদার এবং শোনপুরের মহারাজার দান বিভিন্ন অধ্যাপক-পদের ব্যয়ভার বহন করেছে। একদিকে উচ্চমানের গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রাদেশিকতাকে বর্জন করে দেশ-বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ মানের মেধাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসা, অন্যদিকে বাঙলার ঘরে ঘরে অন্তত এক জন করে যাতে গ্রাজুয়েট হতে পারে, তার জন্য এন্ট্রাস, এফ. এ, আর. বি.এ পাশ কোর্সের পরীক্ষা সহজ করে দেওয়া — এই ছিল আশুতোষের অনুসৃত পথ। অনেকেই শিক্ষার বিস্তারের এই পন্থাকে সমর্থন করেননি, তাঁরা শুধু সমালোচনাই করেছেন, বিকল্প কোনো পথ দিতে পারেননি। কিন্তু একটা কথা কেউ ভেবে দেখেননি : উচ্চশিক্ষার গবেষণার ক্ষেত্রে আশুতোষ কোনো আপোস করেননি — অনেকক্ষেত্রে এমনও হয়েছে ছাত্র যে বিষয় নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে চায়, তার বিষয়বস্তু তিনি নিজেও পরীক্ষা করে দেখে তবে ছাড়পত্র দিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে, তাঁর মত বহুধা বিস্তৃত মেধা ও দূরদৃষ্টি খুব কম শিক্ষাবিদেরই আয়ত্তে ছিল।

চার

তাঁর দূরদৃষ্টির একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর স্মৃতিকথায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক : "চৌদ্দ-পনের বৎসর যাবৎ এম.এ. পরীক্ষায় বাংলাকে চালাইবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলাম। তিনি তাঁহার বিরাট গোঁফ স্ফীত করিয়া গর্জনপূর্বক বলিলেন, 'তোমার পড়ানো যাবার একটা ভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতম শ্রেণীতে তাহাই আবার পড়াইতে

হইবে। শোন কথা!' কিন্তু এই সুরের মধ্যে কোথাও একটা অনুরাগের তান ছিল, সুতরাং আমি প্রহেলিকা সমাধান করিতে না পারিয়াও একেবারে নিরুৎসাহ হই নাই। হঠাৎ ৪-৫ বৎসর পূর্বে একদিন আবার ডাক পড়িল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দীনেশবাবু, এইবার এম.এ.-তে বাঙলা ভাষা চালাব, সিলেবাস তৈরী করুন, এণ্ডারসনকে চিঠি লিখুন, তাঁহার এ সম্বন্ধে কোনো মতামত আছে কি-না?' আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, 'হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ কি?' তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, যুদ্ধ করতে যাবেন। আপনাকে দিয়া এই ৪-৫ বৎসর যাবৎ যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইংরেজি ইতিহাস লিখাইয়াছি, বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, দাশগুপ্তকে দিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলা প্রভৃতি বই লিখাইয়াছি, তাহার মানে জানেন না। এই বইগুলি না থাকিলে এম.এ. পরীক্ষার্থীদের কী পড়াইব? আপনারা যতক্ষণ সোরগোল করিয়াছেন, আমি ততক্ষণ জমি তৈরী করিয়াছি।"

আর উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য স্যার আশুতোষের যে চেষ্টার কথা আগে বলা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আচার্য দীনেশচন্দ্রের এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য — "তিনি জানিতেন, দেশের লোকের প্রাণের সহিত যোগ না রাখিলে এ বিদ্যায়তনের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি তিনি জনসাধারণে চিত্তে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এ দেশের ভাষা, এ দেশের ইতিহাস যাহাতে এ দেশের জনসাধারণ অনুশীলন করিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারে, এজন্য তিনি কর্মক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জ্ঞানকে রাজমুকুটের মতো ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া তাহা দুর্নিরীক্ষ্য একটা সম্পদ করিয়া রাখিতে তিনি চাহেন নাই, তাহা সর্বলোকের অধিগম্য করিতে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বলোক প্রিয় করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন।"

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা দীনেশচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞানপথের পান্থে জাতিভেদ নেই, বর্ণ-বিচার নেই, কোনোরূপ ভেদ-বৈষম্য নেই। ইসলামের মৌলবী বৌদ্ধের ফুঙ্গী, হিন্দুর ভট্টাচার্য, খ্রিষ্টানের পাদরী — যিনি যেখানে ছিলেন, আশুতোষের আহ্বানে ছুটে এসে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ভিড় করেছেন। দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন - "তিনি বাঙালী ছিলেন, বাঙলা দেশকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা ছিল না। বাঙালীর জন্য বাঙালীর জন্য, বোম্বে বোম্বেবাসীর জন্য, ওড়িশা ওড়িয়ার জন্য, বিহার বিহারীর জন্য, আসাম আসামীর জন্য, এই সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার কোনো অবকাশ তিনি জ্ঞানের মন্দিরে রাখেন নাই। ... তিনি তাঁহার এই মহাতীর্থে সমস্ত জগৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের আহ্বানে প্রায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া এক মহামিলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কত রকমের ভাষা, কত রকমের পরিচ্ছদ, মঙ্গোলিয়ান, এরিয়ান,দ্রাবিড় প্রভৃতি নানা বর্ণের, নানা উপাধির, নানা ভাষার পণ্ডিত দূর-দূরান্তর হইতে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, আশুতোষের এই সারস্বত-কুঞ্জে শিক্ষা দিতে আসিয়া ছিলেন।"

পাঁচ

আমরা আগেই বলেছি, স্বদেশী যুগে আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার এই সব কর্মপ্রচেষ্টা স্বদেশী কর্মী ও বিপ্লবীদের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা ভাবতেন, আশুতোষ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপোস করে, তাঁদের অধীনতা স্বীকার করে স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। প্রকৃত সত্য তা নয়। যদিও এটা ঠিক যে, কোনো বিদেশী সরকারের অধীনে থেকে স্বাধীন কর্মপন্থা তথা শিক্ষাপন্থা ঠিক করা খুবই কঠিন, তবু আশুতোষ সেই পথেই হাঁটলেন। কারণ, সেই প্রতিভা ও আত্মমর্যাদা বোধ তাঁর আয়ত্ত ছিল। এ বিষয়ে আশুতোষ যেভাবে আত্মপক্ষ- সমর্থন করেছিলেন, সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে পারি। আচার্য দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে কোলকাতার ছাত্রসমাজ বানচাল হয়ে যাচ্ছিল এবং সিনেট-গৃহের দ্বারদেশে তরুণরা পরস্পরের হাত ধরে এমনভাবে শুয়ে ছিল যে, সেই সম্মিলিত বালক-ব্যূহ ভেদ করে সিনেট-গৃহে ঢোকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল; তখন স্যার আশুতোষ সেখানে এসে ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন - "তোমরা কি চাও? স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়? আমি আজীবন তোমাদের শিক্ষার জন্য পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে আসছি, তোমরা নিজেদের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় চাও, আমি যে তোমাদের তাই দিয়েছি; তোমরা একবার আমার দিকে চাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন-পরিষদে এখন প্রাধান্য কাদের? তোমরা সিনেট- সিন্ডিকেটের সভা-সমিতিগুলো ভালো করে লক্ষ করে দেখো— এখানে বাঙালিই কর্তা। বাঙালিরা যা করে, তাই হয়; এ বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালিদের, এবার স্বভাব-ক্রমেই বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির হাতে এসে পড়েছে, — এখানে বাঙালিরা অসংখ্য টাকা দিয়েছেন এবং সর্ববিষয়ে এটা বাঙালির নিজস্ব হয়েছে। বাঙালির হাতে গড়া, বাঙালির শাসনে নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভেঙে ফেলতে চাও কি অপরাধে? আমাদের সভা-সমিতি, আমাদের কর্মশালার কর্মী ও অধ্যাপকমণ্ডলীদের প্রতি লক্ষ করো। এই বিশ্ববিদ্যায়তনের সদস্যগণ ও পরীক্ষকদের দেশীয় পরিষদ, এখানে আর বিদেশী প্রভাব নেই। আমরাই আমাদের ছেলেদের আমাদের সুধিগণ দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছি। আমি এখানকার একজন কর্মী, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখো, আমি অবিরত যুদ্ধ ঘোষণা করছি

কাদের বিপক্ষে? যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের, এই জ্ঞানমন্দিরের স্বাধীনতা ধ্বংস করতে চায়, যারা শিক্ষার দীপ নিভাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। এই মহাবিদ্যাপীঠ রক্ষার জন্য আমাদেরই পালিত, আমাদেরই ঘোষ, আমাদেরই খয়রা মুক্ত হস্তে আশাতীত দান করেছেন। তোমরা কী — তাঁদের উদার হৃদয়ের দেশপ্রেম-প্রাচুর্যের অবমাননা করবে? তাঁদের প্রদত্ত অর্থ আমাদের জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে আমাদেরই হাতে ব্যয়িত হচ্ছে। তোমরা বালক, তোমরা একজন নেতা চাও যিনি তোমাদের স্বদেশপ্রেম ও স্বরাজ দেবেন। ভালো করে আমাকে দেখো, আমিই তা তোমাদের দিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছি; এই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বরাজের অঙ্গ বলে গ্রহণ করো। তোমরা যাঁকে চাও, আমি সেই ব্যক্তি,স্বরাজের অগ্রদূত, — তোমাদের এত কাছে এসে পড়েছি বলে তুচ্ছ কোরো না, আমি তোমাদেরই একজন — আমাকে পর ভেবো না।"

সেদিনের এই বক্তৃতার মধ্যে নিহিত ছিল যে সত্য ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা তা আচার্য দীনেশচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী ছাত্রদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু আশুতোষের সৎ উদ্দেশ্য ও প্রাণপাত প্রয়াস সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত স্বদেশী নেতাদের কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াল। আচার্য দীনেশচন্দ্র স্বীকার করতে বাধ্য হলেন "... ব্যক্তিত্ব হিসাবে আশুবাবু যত বড়োই হউন না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নীতির বাহিরে তিনি স্বাবলম্বন করিয়া একটা ভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি করিবেন, সরকার পক্ষ ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। ইঁহারা চাহিতেন শিক্ষা বিষয়েই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক — সর্বাগ্রে শাসন মানিয়া চলিতে হইবে। এই ব্রতের এই কথা।" ফলত আশুতোষের সঙ্গে সরকারের বিরোধ একেবারে প্রকাশ্যে এসে পড়ল ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের কনভোকেশন সভায় লাট সাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদে। এই সভায় চ্যান্সেলর রূপে লাট সাহেব স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় নিরপেক্ষ স্বাধীনতার দাবী করতে পারে না, যেহেতু শুরু থেকেই সরকারী কর্তৃত্বাধীনে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। চ্যান্সেলারের এই উক্তির প্রতিবাদে আশুতোষ সেদিন যা বলেছিলেন, তা আমাদের কাছে চিরকালের জন্য স্মরণীয়। তিনি যে ইংরেজ সরকারের ধামাধরা উপাচার্য ছিলেন না, কোনো স্বদেশী নেতার চেয়ে তিনি যে কম স্বাধীনতাপ্রেমিক ছিলেন না, তাঁর এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে এবং পরে উপাচার্য-পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। এক ঐতিহাসিক ভাষণে চ্যান্সেলরকে উদ্দেশ্য করে আশুতোষ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অব্ রোজবারীর রহস্যপূর্ণ- শ্লেষোক্তিগুলি খুব রসান দিয়ে উদ্ধৃত করে বললেন — " উক্ত আর্ল বলেছিলেন, 'আমরা সরকার থেকে বেশি কিছু পাবো না, এমনকি তাঁদের সাহায্য আমরা অতি অল্পই চেয়ে থাকি। কিন্তু 'কম্‌লী নেহি ছোড়তা', সরকার প্রতিদিন আমাদের তাঁদের উপর ভর রেখে দাঁড়াতে আমন্ত্রণ করেন

আমার মনে হল, তাঁদের অতি মৃদুভাবে উচ্চারিত কথাগুলি যেন আমাদের কর্ণমূলে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে, 'তোমাদের পা বেশ ভালো হতে পারে, কিন্তু তোমরা খোঁড়া হও। তোমরা নিজের চোখে দেখতে পাও? তথাপি অন্ধ সাজো। তোমরা শুনতে পাও? কিন্তু তোমাদের কালা হতে হবে। বেশি সাহস দেখাবার দরকার নেই, — এক হাত দিয়ে এই পঙ্গুর লাঠিখানা ধরো দেখি।'... ভীষণ শক্তিশালী ব্যক্তিকেও এইভাবে রোগীর অবস্থায় আনা যেতে পারে। ... মোট কথা প্রতি রন্ধ্রপথে সরকার আমাদের কাজের মধ্যে হস্তচালনার সুযোগ চান।"

লর্ড অব রোজবেরীর এই শ্লোষোক্তি উদ্ধৃত করে আশুতোষ বললেন — "স্বাধীনতার কেন্দ্রস্থানে এই কথা উচ্চারিত হয়েছিল এবং যিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁর দেশে যদি এই কথাগুলি খেটে থাকে, তবে আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপটা যে গুরুতর আশঙ্কার উদ্রেক করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?"

এই পত্রের পর্বও ইতিহাস মনে রাখবে। লর্ড লিটন আশুতোষকে যে চিঠি লিখলেন, তাতে জানতে পারি যে আশুতোষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কর্মশক্তির উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল,— তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কর্তৃপক্ষের কথা শুনে কাজ করবেন, তাহলে এমন মতো যোগ্য ব্যক্তিকে আসন-চ্যুত করা তিনি কিছুতেই উচিত মনে করবেন না। তাতে লিখেছিলেন লিটন যে, আশুতোষ এ পর্যন্ত তাঁদের কোনো সাহায্য করেননি, বরং তাঁদের প্রতি কাজে বাধা দিয়েছেন, সরকারের যে সমালোচনা আশুতোষ করেছেন, তা আদৌ গঠনমূলক নয় বরং আরব্ধ কাজের বিঘ্নকর। এর উত্তরে আশুতোষ যে পত্রটি লিখে তাঁর পদত্যাগ জানিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি যে কোনো যুগের যে কোনো স্বাধীন-চেতা মানুষের কাছে এক অমূল্য পাথেয় বলে গণ্য হবে — উৎসাহী পাঠক চিঠিটি পাবেন ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের আশুতোষ-জীবনীতে। চিঠিতে লেখা সেই চিঠিটিতে যে তেজ বিকীর্ণ হয়েছে, তা এখনো আলো ছড়ায় আমাদের মনে, কোনো অনুবাদে তাকে ধরা যাবে না। বরং এই বিশ্বায়নের ঘনঘটায় আমরা আজ স্মরণ করি একদা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলা তাঁর এই কথাগুলি, যেখানে আমাদের কাছে পথচলার এক চিরন্তন মন্ত্র সঞ্চিত হয়ে আছে:

"তোমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে আগেই নিমজ্জিত হয়ে আছো, তথাপি তোমার স্বকীয় চিন্তা, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে যা কিছু ভালো, তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। পাশ্চাত্যের প্রখর আলোতে অন্ধ হয়ে এদেশের যে মূল্যবান তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ তার প্রতি উপেক্ষাশীল হয়ো না।

তোমরা পাশ্চাত্ত্য জগতের যা কিছু ভালো , তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অবশ্যই হবে, কি
বলে নিজের জাতীয়তা ত্যাগ কোরো না। তোমরা খাঁটি ভারতীয় লোক, একথা
স্বীকার করতে দ্বিধা কোরো না এবং পোশাক ও রুচির অভিমানের ক্ষুদ্রত্ব থেকে নি
সর্বদা রক্ষা কোরো। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তোমাদের দেশের ভাষা যত্নের সঙ্গে অনু
করবে, কারণ দেশীয় ভাষার সাহায্যেই তোমরা এ দেশের জনসাধারণের মন ছুঁতে প
এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার রত্নরাজি তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে।"

উপেন্দ্র কিশোর ও সন্দেশ

বাসন্তী ভট্টাচার্য
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বাংলা শিশু সাহিত্যের দুনিয়ায় উজ্জ্বল মাইল ফলকটির নাম 'সন্দেশ' পত্রিকা। ঠিক একশ বছর আগে 'সন্দেশ'-র যাত্রা শুরু হয়েছিল অমর শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর পরিকল্পনায় এবং সম্পাদনায়। সে সময় উপেন্দ্রকিশোর বয়স পঞ্চাশ। অর্থাৎ ২০১৩ সালটি একই সঙ্গে সন্দেশ পত্রিকার শতবর্ষ এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সার্দ্ধশতবর্ষ পূর্তির শুভক্ষণ।

শিশু সাহিত্যের স্বর্ণযুগের পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ সালে ১০ই মে (মতান্তরে ১২ই মে) অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে। উপেন্দ্রকিশোরের প্রকৃত নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়, পিতা কালীনাথ রায় ছিলেন সংস্কৃত, আরবি ভাষায় পণ্ডিত। তিনি ইংরাজী ভাষায় ও দক্ষ ছিলেন। ফলে একদিকে ফারসি ভাষায় লিখিত সনাতন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা যেমন তাঁর জ্ঞাত ছিল, একই সঙ্গে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন ইংরেজ শাসনাধীন নতুন ভারত বর্ষের জমিজমা সংক্রান্ত নতুন আইন কানুন বিষয়ে। তাঁর দক্ষতা তাঁকে একই সঙ্গে সাফল্য ও আর্থিক স্বচ্ছন্দ দিয়েছিল। তাঁর দুয়ারে হাতি বাঁধা থাকত।

কালীনাথ রায়ের আত্মীয় হরিকিশোর রায় চৌধুরী যিনি আবার ছিলেন ময়মনসিংহের জমিদার তিনি কামদারঞ্জনকে পাঁচ বছর বয়সে দত্তক নেন। কামদারঞ্জনের নতুন নামকরণ হয়- উপেন্দ্রকিশোর, জমিদারী আভিজাত্যে পদবিও পরিবর্তিত হয় রায় থেকে রায়চৌধুরী। পরবর্তীকালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী হিসাবেই তিনি খ্যাত হন।

উপেন্দ্রকিশোরের শিক্ষা শুরু হয় ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে। তারপর তাঁর জীবন ও শিক্ষা দুইই চলে আসে গ্রাম থেকে শহর কলকাতায়। কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার পর ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন—অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ১৮৮৪ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর আঁকাআঁকি শুরু হয়েছিল স্কুল জীবনেই। আর প্রথম সাহিত্য রচনা প্রকাশ পেল কলেজ জীবনে ১৮৮৩ সালে 'সখা' পত্রিকায়। ফেলে আসা গ্রামজীবনের সহজতা তিনি হারিয়ে ফেললেন না তাঁর শহুরে জীবনে। বরং 'টুনটুনির বই', 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন', 'ঘ্যাঁঘাসুর' প্রভৃতি রচনা

অনাবিল আনন্দের আকর হয়ে রইল। কেবলই রূপকথা ধর্মী রচনা নয়, পুরাণ, র
মহাভারত তাঁর হাতে শিশু পাঠ্য হয়ে উঠল। এমনকি দেশ-বিদেশের প্রাচীন
জন্তু-জানোয়ারের কথা সহজ ভাষায় লিখিত হল তাঁর হাতে। 'সেকালের
শিরোনামে। লিখিত বিষয়কে শিশুদের কাছে আর্কষণীয় করে তুলতে তিনি প্রায়
রচনার সাথেই এঁকে দিলেন নানা মৌলিক ছবি।

বিখ্যাত দুই বিজ্ঞান সাধক জগদীশ চন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধু
বন্ধুত্ব বুঝি উস্কে দিয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে। 'বিবিধ
এ প্রকাশ পায় বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। 'সখা' পত্রিকায় 'পুরাতন কথায়' শিরো
তিনি জানান পৃথিবীর জন্মের কথা, 'মুকুল' পত্রিকায় 'আকাশের কথা' শিরোনামে
জ্যোর্তিমণ্ডলের ইতিহাস, 'বান ডাকা' শিরোনামে লেখেন জোয়ার ভাঁটার বৈ
ব্যাখা, 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় লেখেন 'অন্ধদের বই পড়া' শিরোনামে ব্রেইল প
বিবরণ।

এর পাশাপাশি তিনি লেখেন নানা স্বাদের ছোট ছোট গল্প, ছড়া, ভ্রমণ-ক
দেশ-বিদেশের রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী। সুগায়ক উপেন্দ্রকিশোর নিজে
বেহালা বাজাতেন। সঙ্গীত বিষয়ক দুটি বইও লেখেন তিনি — 'সহজ বেহালা
এবং 'শিক্ষক ব্যাতিরেকে হারমোনিয়াম'।

সেই সময়ের ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত
উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর পালক পিতার মৃত্যুর পর তাঁর এই ধর্মবোধ তাঁকে
দিয়েছিল। অনেক গভীর ধর্মসঙ্গীত তিনি রচনা করে সুরসংযোগ করেন।

উপেন্দ্রকিশোরের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাহিত্যকীর্তি হল তাঁর প্রবর্তিত এবং সম্প
'সন্দেশ' পত্রিকা। এই মাসিক পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয় ১৯১৩ সালে (U. Ray
Sons) কোম্পানির প্রকাশনায়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২২, সুকিয়া স্ট্রীট থে
পরবর্তীকালে উপেন্দ্রকিশোর নির্মিত ১০০,গড়পার রোডের বাড়িতে স্থানান্তরি
'সন্দেশ' কার্যালয়।

'সন্দেশ' পত্রিকার পরিকল্পনা, চিত্রায়ন এমনকি নামকরণ ও করেছি
উপেন্দ্রকিশোর। 'সন্দেশ' যা একইসঙ্গে বাচ্চাদের কাছে উপাদেয় মিষ্টান্ন এবং স
শব্দার্থে 'সন্দেশ' মানে খবরও বটে। শিশুদের কাছে আনন্দ ও জ্ঞান দুয়েরই যোগা
হয়ে উঠেছিল 'সন্দেশ' পত্রিকা, 'সন্দেশ ছিল ভারতে প্রথম সচিত্র প
উপেন্দ্রকিশোরই এদেশে প্রথম উন্নত এবং রঙিন ছবি ছাপার প্রবর্তন করেন।

শিল্পের নানা আধুনিক পদ্ধতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা মুদ্রিত হয় [illegible] থেকে প্রকাশিত পেনরোজ বার্ষিক পত্রিকায়। দেশে-বিদেশে তাঁর ভাবনা সমাদৃত হয়। 'সন্দেশ'-র পাতা ভরে উঠতে থাকে উপেন্দ্রকিশোরের নানা স্বাদের রচনা এবং নানা বর্ণের ছবিতে উন্মোচিত হয় শিশুসাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত।

মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির জন্য এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত U. Ray and Sons কোম্পানির [illegible] জন্য উপেন্দ্রকিশোর পুত্র সুকুমারকে পাঠিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারের বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুদ্রণ শিল্পের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুকুমার রায় দেশে ফিরে আসেন এবং হয়ে ওঠেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী।

১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের আকস্মিক মৃত্যু হয় ২০শে ডিসেম্বর মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পর 'সন্দেশ'-র ভার গ্রহণ করেন সুকুমার রায়। সুকুমার রায়ের [illegible], হাস্যরস পরিবেশনের দক্ষতা 'সন্দেশ' কে করে তোলে ছোটোদের জন্য পরিবেশিত প্রথম সারির পত্রিকা। বিশেষত 'ননসেন্স'-র পরিবেশনে 'সন্দেশ' হয়ে উঠে বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয়। বলা যায়, উপেন্দ্রকিশোরের হাতে 'সন্দেশ' ছিল শিশুপাঠ্য, সুকুমার রায়ের দক্ষতায় 'সন্দেশ' শিশু মনস্তত্ত্বের গণ্ডি পেরিয়ে কিশোর মন এবং বড়দের কাছেও আদৃত হয়ে উঠল।

১৯২৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুতে 'সন্দেশ'-র দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সুকুমার রায়ের ভাই সুবিনয় রায়। সুকুমারের হাস্যরস পরিবেশনের দক্ষতা তাঁর ছিল না। ফলে 'সন্দেশ'-র প্রকাশনা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ল। ১৯৩৪ সালে বন্ধ হয়ে গেল এর প্রকাশ। ১৯৬১ সালে সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায় এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশিত হল 'সন্দেশ'। 'সন্দেশ' কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল সত্যজিৎ রায়ের ছোটোদের জন্য লেখা নানা স্বাদের অনবদ্য [illegible] কাহিনীগুলি এবং অবশ্যই ফেলুদা এবং প্রফেসর শঙ্কুর কাহিনী সম্ভার।

পরবর্তীকালে বার বার রদবদল ঘটেছে 'সন্দেশ'-র সম্পাদক পদে। কখনো লীলা মজুমদার, কখনো নলিনী দাস অলঙ্কৃত করেছেন সম্পাদক পদ। এর মাঝে মধ্যে ১৯৬৩ সালে সত্যজিৎ রায় গঠন করেন 'সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড' [illegible] একটি সাহিত্যিক সংস্থা। এই সংস্থার মাধ্যমেই পরিচালিত হয় 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের কার্যভার।

সত্যজিৎ রায়ের পর 'সন্দেশ'-র কার্যভার গ্রহণ করেন সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়।

আজকের শিশু কিশোর মন অনেক বেশি প্রভাবিত বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেলের দ্বারা, নানা

রকম কার্টুন ও কমিক চরিত্রের দ্বারা। তা ছাপা বই পড়ার বদলে মোবাইল, ইন্
গুগল ব্যবহার করে বেশি। ছোটদের পত্রিকাকে রঙিন ছবিতে, উন্নত মানের
সাজিয়ে তুলতে উপেন্দ্রকিশোর যে প্রয়াস করে ছিলেন তাতে কেবল ছো
বড়দের মনেও চমক লেগে গিয়েছিল। আজকের সহস্র মিডিয়া অধ্যুষিত দুনিয়
চমক লাগানোর উপকরণ এত বেশি যে মানুষ আজ পাঠ বিমুখ। তবু তার
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সার্দ্ধশতবর্ষ এবং সন্দেশ পত্রিকায় শতবর্ষপূর্তি উ
'সন্দেশ'পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, নন্দন চত্বরে চলচিত্র প্রদর্শনের কর্মসূচী প
পরিকল্পনা নতুনভাবে আশা জাগায়।

বস্তুত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কেবলই একজন শিশুসাহিত্যিক ছিলেন না
ছিলেন একাধারে শিল্পী, সংগীতকার, বিজ্ঞানমনস্ক ধর্মপ্রাণ মানুষ, সর্বোপ
সাংগঠনিক মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' ও কেবলই একটি পত্রিকা নয়, তাঁর
বীজ থেকে মহীরূহ হয়ে ওঠা বিরাট প্রতিষ্ঠান। শতবর্ষ পেরোনো সন্দেশ
ছোটোদের জন্য নয়, সমস্ত সাহিত্য প্রেমীর কাছেই আজও আকাঙ্খার ধন।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল, স্বাদেশিকতা ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ডঃ মমতাজ বেগম
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

নাট্যমঞ্চ ও নাট্যকারের সম্পর্ক চিরদিনই গভীর পারস্পরিক সম্পর্কে গ্রথিত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে ভিন্ন মাত্রা আনে। রচনার আঙ্গিক, ভাব-ভাষা-চরিত্র নির্মাণে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্য। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও স্বাদেশিকতা তাঁকে আপ্লুত করে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি মূলত ঐতিহাসিক নাট্যকার রূপেই পরিচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন বৈচিত্র্যময় নাটক লিখে এবং অভিনয় করিয়ে একটা যুগ সৃষ্টি করে ফেলেছেন তখন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে শোনা যায় নতুন সুরব্যঞ্জনা। ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল প্রকাশিত ও কার্যকরী হয়। এই আইনে বলা থাকে -

'Whenever the provincial Government is of opinion that any play, pantomime, or other drama performed or about to perform in a public place is -

a) Of a scandalous or defamatory in nature

b) Likely to exite feelings of disaffection to the Government established by law in British India (or BritishBurma)

c) Likely to deprave and corrupt person present at the performances"

[section-3, Dramatic performance Act, 1876]'

নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের দাপটে নাট্যসংস্থাগুলি মানসিক ও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত [illegible] সামাজিক, পারিবারিক নাটকের অভিনয় করানোই তারা শ্রেয় বলে মনে করেন। [illegible] প্রহসন, প্যান্টোমাইম বা নক্সাজাতীয় রচনার অভিনয় হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, [illegible] বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারের নাটকের পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক [illegible] 'ত্র্যহস্পর্শ' অভিনীত হয় ১৮৯৯ সালে থিয়েটারে, উনিশ শতকের শেষের [illegible] থেকেই স্টার, মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটার সমানভাবে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেছে। [illegible] মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বেশি অভিনীত হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯০৩ সাল একটি বিশেষ দিকচিহ্ন হিসাবে বিবে
ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তৈরী করেন এবং 'দ্য পাইওনিয়র' প
তার আভাস দেন। ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সরকারি আদেশ রুজু হয় এবং
অক্টোবর কার্যকরী হয়। সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদ হিসাবে বিলেতি দ্রব্য বর্জন বা ব
আন্দোলন শুরু হয়। রঙ্গালয়গুলিও তাদের বিমর্ষতা ত্যাগ করে প্রতিবাদী হয়ে ও
জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের নাটক অভিনয় করতে বা লিখতে তারা ভয় পে
কিন্তু পণ - উন্মাদনার ঢেউয়ে নাট্যকাররা আবার জাতীয়তাবাদী বা স্বদেশভাবনা
নাটক লিখতে শুরু করলেন। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন ঘো
করেন, ১৬ই অক্টোবরথেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। বাংলা ভেঙে দুভাগ করে প
উত্তরবঙ্গ যুক্ত হবে অসম প্রদেশের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হবে বিহার ওড়িশার স
স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত প্রতিবাদে বাংলা তথা ভারতবর্ষ ভিন্ন চেহারা নেয়। ব
রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকারেরাও এই প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকেনি। স্টার থিয়েটার বিজ্ঞ
জানায় -

'Mourning at the 'STAR'
Partition of Bengal
No amusement work at the
Star Theatre
On
Wednesday, the 6th September
Amritlal Bose
Manager (Amritabazar Patrika : 06.09.1905)'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে ও চিঠিপত্রে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মনোভাব
বয়কট আন্দোলনের তুল্যমূল্য বিচার করে চিঠি লেখেন। জাতীয়তাবাদের সকল
বৈশিষ্ট্য দ্বিজেন্দ্রলাল মেনে নিতে পারেননি। দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য ব
নীতিকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি মতামত তুলে ধরা
পারে -

ক) 'আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ
ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতে সম্ভব নয়'।

'কাজের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই, শুধু বক্তৃতা আর বক্তৃতা। ...... এখন কি উপায়ে এই সব আত্মসর্বস্ব, নাম কা ওয়াস্তে নেতাদের হাত থেকে দেশবাসীকে, বিশেষত আমার ভবিষ্যত ভরসাস্থল, আশা কল্পতরু, সোনার চাঁদ ঐ যুবকদিগকে রক্ষা করা যায় তাই আমি অনেক সময় ভাবি।"

সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আত্মশক্তিতে বিকশিত হয়ে মানুষ হওয়ার মন্ত্র শিখিয়েছেন। [illegible]র স্রোতে ভেসে গিয়ে লোক দেখানো দেশাত্মবোধকে ঘৃণা করেছেন।

[illegible]নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ না হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস', [illegible]পতন', 'রাণাপ্রতাপ' প্রভৃতি মঞ্চায়নের জন্য আপত্তিজনক হিসেবে বিবেচিত [illegible]। কারণ প্রতিটি নাটকেই রাজনৈতিক দেশানুরাগ, উদ্দীপিত দেশপ্রেম, বীররসাত্মক [illegible] উক্তি-প্রত্যুক্তির চমৎকারিত্ব ইংরেজ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। [illegible]সিক নাটকে জাতীয় উন্মাদনা সাধারণ লক্ষণ ও মৌল প্রেরণা হলেও ইংরেজ [illegible] তা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। উপরোক্ত নাটক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সময়কালে লেখা [illegible] 'প্রতাপসিংহ (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'মেবারপতন' (১৯০৮) স্বদেশী [illegible]নের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় লেখা হয়।

'প্রতাপসিংহ' নাটক মঞ্চায়নের জন্য আপত্তিজনক হয় মূলত হিন্দু-মুসলমানের [illegible]নের চেষ্টার জন্য। মানসিংহ ও রাজপুতদের কথোপকথনের অংশ থেকে [illegible] স্বদেশী আন্দোলন স্বরূপ -

[illegible]লিয়র : ভারতীয় স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।

মানসিংহ : জাতীয় জীবন থাকলে তবে তা স্বাধীনতা। সে জীবন অনেকদিন গিয়াছে জাতি এখন পচছে।

[illegible] : কি সে?

মানসিংহ : এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা জীবনের লক্ষণ নয়। (পঞ্চম অঙ্ক/ষষ্ঠ দৃশ্য)

[illegible] বলেছেন -

[illegible] : যাও বীর। তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্ত্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে,

আরাবল্লির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে উপত্যকায় জীবিত থাকবে
রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্বত তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে
থাকবে'। (পঞ্চম অঙ্ক/অষ্টম দৃশ্য)

দেশপ্রেমের প্রধান মন্ত্র হল মানবিকতাবোধ ও বীরত্ব। তৎকালীন সময়ের উ
করে যুক্তিনিষ্ঠভাবে প্রতিটি চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন। এই ধরনের নাটক
একজন মানুষ অনুপ্রাণিত হলেও এতে ইংরেজদের বিপদ, এই কারণে নাটকটির
বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া হিন্দু - মুসলমানের ঐক্যের জোরাল কণ্ঠস্বর শোনা

ক) আকবর রাণাপ্রতাপকে যথার্থ বীরের সম্মান দিয়েছেন - 'তোমার
আমার উপরে ..... তুমি জয়ী, আমি বিজিত'। (পঞ্চম অঙ্ক/ পঞ্চম দৃশ্য

খ) মানসিংহের উক্তি - 'আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসল
জাতি এক করা মিশ্রিত করা, সমস্বত্ত্বাধিকারী প্রজা করা ..... যদি মু
হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ কর্তে পার্ত, আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন'।
অঙ্ক/ষষ্ঠ দৃশ্য)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল কথা ছিল বাংলাকে ভাগ না করা। কিন্তু হিন্দু - মুসল
স্পর্শকাতর দিকগুলিকে আঘাত করে বঙ্গভঙ্গ করতে পারলে ইংরেজ সর
শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্য রক্ষিত হবে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের মূল চরিত্রগুলি
অপ্রধান চরিত্রের মধ্যেও দেশাত্মবোধের ভাবনা প্রকট। ইরা চরিত্র কোন কিছুর
দেশদ্রোহী হতে পারে না, মানবিকতা বিসর্জন দিতে পারে না। তার উক্তি - 'না
পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময়, কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি,
কর্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে যেদিন স্বার্থ
স্বার্থলাভ হবে - সেই স্বর্গ'। (তৃতীয় অঙ্ক/সপ্তম দৃশ্য)

আমরা জানি 'জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী'। সেই ভাবনা থেকেই দ্বিজেন্দ্রলা
দেশাত্মবোধের ভাবনায় ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। পা
প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা ও সম্রাট আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসার মধ্যে সখীত্ব
করেছেন।

আমাদের মনে হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মনোমোহনের ব
অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশানুরাগে উজ্জীবিত হয়েছেন। রেভারেন্ড লঙ সাহে
'Descriptive Catalogue of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন -

'যে সকল ধর্ম মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য ও পরম আদরণীয়, স্বদেশানুরাগ ধর্ম তাহার অগ্রগণ্য। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য কেবল তিন প্রকার অর্থাৎ প্রথমতঃ আপনার প্রতি, দ্বিতীয়তঃ অপর মানবগণের প্রতি, তৃতীয়তঃ পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি কর্তব্যসাধনে ভারপ্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু এক স্বদেশানুরাগ ধর্ম প্রতিপালন করিলেই সেই তিনের প্রায় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নাটকের মধ্যে সেই কথাকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন নানাভাবে।

মঞ্চায়নের জন্য নিষিদ্ধ আর একটি নাটক হল টডের রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) নাটক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকার উপযোগী নাটকটি ইংরেজ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ এই গ্রন্থের ভূমিকায় নাট্যকারের উক্তি - 'আজ পর্যন্ত হিন্দু পাঠক নাটক নভেলে (রাজসিংহ ভিন্ন) কেবল বিজাতীয়ের কাছে স্বজাতীয়ের পরাজয় বার্তাই পড়িয়া আসিয়াছেন। একদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর, এই দুর্গাদাসের বিজয় - দুন্দুভি তাঁহাদের কর্ণে সঙ্গীত বর্ষণ করিবে নাকি।'

ভারতবর্ষীয় মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি গড়ে তোলার জন্য দুর্গাদাসকে জাতীয় বীর হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে অভাব ছিল গভীর স্বদেশপ্রেমের এবং একনিষ্ঠতার। দুর্গাদাসকে সামনে রেখে ভারতবাসীকে একটা [illegible] দিয়েছেন। অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আভিজাত্যবোধ, ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য, কর্তব্যবোধ ও মহান দেশপ্রেমের প্রতিমূর্তি। দুর্গাদাসের সংগ্রাম, [illegible] স্বহিতৈষণা, যশোবন্ত পত্নীর স্বদেশপ্রেম সর্বত্রই ইংরেজ বিরোধিতার [illegible] লক্ষ্য করে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করা হয়।

রাজস্থানের কাহিনী নিয়ে লেখা আর একটি নাটক হল 'মেবারপতন' (১৯০৮)। এই নাটকের ভূমিকায় লেখক বলেন - 'এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া চলিয়াছি। [illegible] বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহা কীর্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যক্তিগতভাবে মনুষ্যত্বের পূজারী ছিলেন। তাঁর 'মেবারপতন' নাটকে [illegible] চিঠিপত্রে সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ২.৫.১৯০৬ তারিখে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখেন -

'আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি - যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদে
নগণ্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন - আমি দেশ চিনি না, বিদ্বেষ মানি না, আ
চাই শুধু বীর্যবল - ব্রহ্মচর্য, চাই শুধু ঐ সত্যনিষ্ঠা, চাই শুধু আসল, খাঁটি ধ্রুব ও নিটো
ধর্মবল আর ঐ এক কথায় মনুষ্যত্ব'।'

'মেবারপতন নাটকেও একথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে -

'কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই..... আবার তোরা মানুষ হ।
পরের পরে কেন এ রোষ
নিজেরই যদি শত্রু হোস?

তোদের এ' বে নিজেরই দোষ - আবার তোরা মানুষ হ'। (পঞ্চম/অষ্টম দৃশ্য)

অর্থাৎ পরাধীনতার জন্য আমরা ভারতীয়রাই একান্তভাবে দায়ী। অমানুষ হয়েই এক
করতে পেরেছে কারণ নানুষ একাজ করতে পারে না।

এই নাটকে যুগলক্ষণ, স্বদেশী আন্দোলন, মানবিকতার জাগরণের চেষ্টা প্রবল হওয়
কারণে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের আওতায় পড়ে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মূলত ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসাবেই পরিচি
যেমন 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০
'মেবারপতন' (১৯০৮), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'সাহাজান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগু
(১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫) প্রভৃতি। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম তাঁর সামাজি
পারিবারিক নাটকগুলিই অভিনীত হয়, পরবর্তীকালে পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকও
অভিনয় হয়। কারণ নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের প্রভাব নাট্যশালাগুলিকে গভীরভাবে নাড়ি
দিয়েছিল।

- ১৮৯৯ সালে স্টার থিয়েটারে 'বিরহ' নাটক অভিনীত হয়।
- ১৯০০ সালে নতুন বিদ্যুৎ আলোর ব্যবহার, নতুন আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
দ্বারা 'ত্র্যহস্পর্শ' অভিনীত হয়।
- ১৯০৮ ১৪ই মার্চ গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের পাশে দ্বিজেন্দ্রলালে
'নূরজাহান', 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং ২৫শে ডিসেম্বর 'মেবারপতন' অভিনীত

মিনার্ভা থিয়েটারে। এই বছরের ১৯শে সেপ্টেম্বর অভিনীত হয় 'সোরাবরুস্তম'।

- ১৯০৯ সালের ২১শে আগস্ট মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় দর্শকমহলে সাড়া ফেলে দেয়। এই বছরের ৮ই ডিসেম্বর 'দুর্গাদাস' অভিনীত হয়। 'সাজাহান' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন প্রিয়নাথ ঘোষ - সাজাহান, দানীবাবু - ঔরঙ্গজেব, হরিভূষণ ভট্টাচার্য - দিলদার, সুধীরলাল - জাহানারা, সুশীলাবালা - পিয়ারা, তারক পালিত - দারা, পরবর্তীকালে তারাসুন্দরী জাহানারার ভূমিকায় করেন এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিলদার অভিনয় করে। জাহানারা, সাজাহান এবং পিয়ারা চরিত্রের অভিনয় বিশেষ জীবন্ত রূপ লাভ করে।

- ১৯১১ সালের ২২ শে জুলাই দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। দানীবাবু চাণক্য চরিত্রের অভূতপূর্ব অভিনয় করেন। নরীসুন্দরী ছায়া চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এগুলির বারবার অভিনয়ের পাশে ১৯১১ সালে স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের মজার নাটকে 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয় দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল। কারণ স্টেজে একটা মস্ত ট্রেন চলছে আর লোকজন তা থেকে ওঠানামা করছে।

- ১৯১২ সালের ১৭ই আগস্ট স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় 'পরপারে' নাটক। এই বছরের ১৬ই নভেম্বর কৌতুক গীতিনাট্য 'আনন্দবিদায়' এবং 'পরপারে' একই দিনে অভিনয় হয়। কিন্তু 'আনন্দবিদায়' নাটকে রূপকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা হলে আর কখনো এই নাটকের অভিনয় হয়নি।

- ১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ঠিক তার পরের বছর ১৯১৩ সালের ১৭ই মে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হয়। স্টার থিয়েটারে ১৯১৫-এর ১২ই ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় হয়। সাজাহানের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ অসাধারণ অভিনয় করেন।

- ১৯২২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত', সাজাহান'

নাটকের অভিনয় হয় মিনার্ভায়। ব্রিটিশবিরোধী ভাবনা আছে ব
নাটকগুলির অভিনয় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।

- দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ১০০ বছর অতিক্রান্ত। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক
আজও স্বমহিমায় অভিনীত হয় বিভিন্ন মঞ্চে। আজ দেশ স্বাধীন হ
স্বাদেশিকতা অভাব যথেষ্ট আছে। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তু
নাটকগুলির মঞ্চায়ন প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা স
দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন - 'দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্বদেশভক্তি সর্বজ
দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর
উদ্রেক করে না'।[১]

মানবতার মহৎ গৌরবে তাঁর প্রত্যেকটি নাটক উজ্জ্বল। যুক্তিবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল নব
জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতাকে তাঁর নাটকে প্রকাশ করেছেন। কখনই কুস
অমানবিকতা ও অযাচিত আবেগকে স্থান দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন - 'য
আমাদের সামাজিক অনেক প্রথাই উঠিয়া না যায় অর্থাৎ সময়ানুরূপ সংস্কৃত না
ততদিন আমাদের politically এক হওয়া অসম্ভব।'[২]

তাঁর এই আত্মসচেতনতা ও মানবিকতাবোধ প্রথমপর্বের নাটকগুলিকে
রেখেছিল। এই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের উপরে নিজস্ব ভাবনার
দেখা গেছে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল সাময়িকভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে মঞ্চায়নে বাধা দি
আপন শক্তিতে তারা প্রকাশ পেয়েছে মঞ্চে। 'নূরজাহান', 'সাজাহান' তাঁর বিখ্যা
মঞ্চসফল নাটক। নাটকগুলিতে মানবিকতাবোধ, স্বাদেশিকতা যথেষ্ট। কিন্তু
থেকেও বড় হয়ে উঠেছে নূরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সাজাহানের পিতৃত্ব। আমরা ব
চাই নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য সেহেতু মঞ্চায়ন ছাড়া তা সফল নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল
তিনটি নাটক নিয়ন্ত্রণ বিলের আওতায় বাধা পেয়ে আজও পাঠক হৃদয়ে, দর্শক
সমান আবেগ সৃষ্টি করতে পারে তা কালজয়ী। যথার্থ সৃষ্টির কোন পরিমাপ নেই
তা যুগে যুগে কালে কালে নানা ব্যঞ্জনায় সত্য হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতির প্রান্ত ধরে ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়ে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক
দেখা যাবে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা কখনো থেমে থা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এমনই একজন হোতা যিনি এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে

উল্লেখপঞ্জীঃ

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী, পৃ-১৫৫

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী, পৃ-২১১

দ্বিজেন্দ্রলাল - দেবকুমার রায় চৌধুরী, ১৩২৮, পৃ - ৩৯২

প্রাগুক্ত পৃঃ - ৩৯২

দ্বিজেন্দ্রলাল - নবকৃষ্ণ ঘোষ - দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ - ১৪৮

দ্বিজেন্দ্রলাল - দেবকুমার রায় চৌধুরী পৃঃ - ৪৪৪

বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ পৃঃ - ২৪৪

দ্বিজেন্দ্রলাল - দেবকুমার রায়চৌধুরী পৃঃ - ৪৩৮

M

in th

TABLE 2

Our homage to
Moulana Abul Kalam Azad
and
Sukumar Roy
in their 125th Birth Anniversary

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঃ এক অপরাজিত দেশনায়ক ঃ

মীরাতুন নাহার

কিন্তু দেশবাসী তাঁকে আবুল কালাম আজাদ নামে জেনেছেন। কিন্তু সেটি তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম মহিউদ্দীন আহমেদ। তাঁর নামটির মতো প্রকৃত মানুষটিও দেশবাসীর নজরের অগোচরেই রয়ে গেছেন। তাঁকে কেউ বুঝেছেন কেবল দেশপ্রেমিক হিসাবে আবার কেউ কেবলই ইসলাম প্রেমী হিসেবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, তিনি নিজের দেশকে যেমন সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন তেমনি নিজের ধর্মকেও। জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং ইসলামী ভাবধারা উভয়ই তাঁর মধ্যে সমান বেগে একেবারে পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। এই সত্য না বুঝে কেউ তাঁকে ভেবেছেন 'মৌলানা'-কেবলই ধর্মভক্ত, অন্যদিকে কেউ বলেছেন তিনি কেবলই ভারতীয়। আমাদের জীবনের এটি একটি চরম ট্রাজেডি, তদুপরি, দেশবাসী তাঁকে কেবল একজন রাজনীতিবিদ হিসাবেই দেখেছেন। সত্য ও স্বদেশানুরাগ, কল্যাণানুরাগ, ধর্মানুরাগ, সৌন্দর্যানুরাগ, জ্ঞানানুরাগ, সঙ্গীতানুরাগ, প্রভৃতি বিচিত্র অনুরাগে রঞ্জিত তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় সকলের অজানাই রয়ে গেছে।

তিনি তাঁর জীবনকাহিনী বলতে গিয়ে নিজের পিতার সম্পর্কে বহু কথা জানিয়েছেন। তাঁর পিতা খায়রুদ্দীনের প্রভাব পড়েছিল আজাদের জীবনের প্রারম্ভিক কালে সমধিক। তিনি তাঁর পিতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। খায়রুদ্দীন ছিলেন একজন অভিনব ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মপ্রচারক। ভক্তদের তিনি তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ করে রাখতেন। তিনি অপরের প্রতি অতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি সুন্দর ও দামী পোশাক পরতে ভালবাসতেন এবং বলতেন ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রদর্শনের এ এক সর্বোৎকৃষ্ট উপায়' তিনি বই ভালোবাসতেন এতো যে, যেখানে বই দেখতেন সেখানে প্রয়োজনাধিক সময় কাটাতেন। তিনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। কখনো কারো কাছে সাহায্য প্রার্থি হতেন না। সত্যভাষণে ছিল অকুতোভয়। ধনীদের প্রতি কখনো বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন না সন্তানদের বলতেন, ধনীর সামনে গর্বিত হও, দরিদ্রের সামনে বিনয়নম্র ; এই-ই সত্যকার মনুষ্যত্ব'। পিতার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আজাদের মধ্যে সার্থক রূপ লাভ করেছিল। তিনি কখনো অসম্মানিত হওয়ার মতো কাজ করেননি। কারো সামনে নত হননি, উচ্চপদাধিকারী, জনগন বা সরকার কারো কাছে নয়। এসব দিক থেকে তিনি

তাঁর পিতার যথার্থ উত্তরাধিকারী। কেবল ধর্মীয় কিছু বিষয়ে পিতার সঙ্গে মতবিরোধিতা ঘটেছিল।

১৮৫৭ সালে সংঘটিত বিদ্রোহের সমসাময়িককালে খায়রুদ্দীনের পরিবার মক্কায় বাসস্থান গড়ে তোলে এবং তিনি এক আরব রমণীকে বিয়ে করেন। ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের পরিস্থিতির প্রতি বীতরাগ হয়ে বহু মুসলমান ভারতবর্ষ ছেড়ে মক্কায় তাঁদের মধ্যেও আজাদের পিতার মাতামহ মুনওয়ার উদ্দীন একজন। খায়রুদ্দীন দৌহিত্র। তিনি যে আরব মহিলাকে বিয়ে করেন তাঁর নাম জয়নব বিবি। ১৮৮৮ আজাদের জন্ম হয়। মক্কায় তিনি তাঁর মাতা-পিতা, তিন বোন ও এক ভাইয়ের দশবছর বয়স পর্যন্ত কাটান। সে সময় আরবীই তাঁর মাতৃভাষা। তাঁর মাতা উর্দু পছন্দ করতেন না বলে আজাদকে তাঁর মাতা ও বোনেদের সঙ্গে আরবি ভাষাতেই বলতে হত। কিন্তু পিতা উর্দু ভাষাই বলতেন এবং তাঁর বাড়িতে উর্দুভা আসা-যাওয়া করতেন। মক্কাতে তাদের বাড়িটি ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার দ্বীপসদৃশ উঠেছিল। ১৮৯৮ সালে আজাদের পিতা চিকিৎসার প্রয়োজনে কলকাতায় আসেন ভক্তবৃন্দের আগ্রহে কলকাতায় থেকে যান। এর এক বছর পরে আজাদ মাতৃ হার এরপরে পরিবারে পিতার প্রভাব দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। প্রাত্যাহিক জীবনের প্রতিটি শয্যাগ্রহণ ও ত্যাগ, প্রার্থনা, খাদ্যগ্রহন, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নির্দেশিত নিয়মাবলী একমাত্র পালনীয়। খেলাধুলা ও শিক্ষা বিষয়ে তিনি ছিলেন অতিশয় কঠোর নি তিনি নিজে সন্তানদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান শেষ করে তবেই গৃহশিক্ষকদের পাঠগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। আজাদ তাঁর পাঠ্যবিষয় অতিদ্রুত শিখে নিতে পার এবং শেখার পর সেসব বিষয়ে তিনি বলতে ভালবাসতেন এবং কাউকে না শোনাতেন তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা। এভাবে তিনি বিস্ময়কর বাকপ্রতিভার অধিকারী বালক' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

এভাবে কঠোর শাসন নিয়ন্ত্রণের পরিমণ্ডলে জীবনের শুরুর কাল কাটার পরে পরবর্তী সময়ে 'মুক্ত মানুষ' হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং সে স্বপ্ন তাঁর সফল জ্ঞানানুশীলনের মাঝে তিনি মুক্তির সাধ পেলেন। উর্দু সাহিত্যপাঠের নেশায় নে হলেন। কবিতা প্রেমিক হয়ে উঠলেন। মৌলবী আবদুল ওয়াহিব খান তাঁকে ফারসী কবিতার অনুরাগী করে তোলেন। এবং ছদ্মনামে তাঁর প্রথম "নঈরঙ্গ-ই-ঈ-আলম" প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। খুব উচ্চমানের না হলে পত্রিকায় আজাদ তাঁর কবিতা রচনার প্রতিভা -প্রকাশে সচেষ্ট হন এবং বহু গু

ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে বৃহত্তর, উদার দৃষ্টিভঙ্গি লাভে সক্ষম হন। পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার স্বপ্ন তাঁকে উদ্দীপিত করে এবং সেই কাজটি তখন তাঁর কাছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার সামিল বলে মনে হয়। তখন তাঁর বয়স এগারো বছর মাত্র। বারো বছর বয়সে তিনি "মিসবাহ" নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যা কেবল তিনমাস আয়ু লাভ করে। তিনি তারপর বিভিন্ন পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কয়েক বছর পরে সঙ্গীত বিষয়ে পড়াশুনা করেন। চার পাঁচ বছর সেতার বাজানো অভ্যাস করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, সংগীত বিনা জীবন স্বাদহীন।

পিতা চেয়েছিলেন তিনি পীর হবেন এবং সেইভাবেই তাঁর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছিল, তাতে লাভ হল, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার ভীত মজবুত হল। কিন্তু তিনি শৈশবের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জগতের স্বাদ পেতে চাইলেন। পাশে পেলেন এ সময় স্যার সৈয়দ আহমেদ খান কে। তাঁর কাছে ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান চর্চার হাতেখড়ি হল। তিন খুঁজে পেলেন তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের সব জিজ্ঞাসার উত্তর। আধুনিক জ্ঞানের ভাণ্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। উর্দু, ফারসী ও আরবী ভাষায় লিখিত আধুনিক জ্ঞান-সম্পদ সমৃদ্ধ সমস্ত গ্রন্থ তাঁর আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠল। শৈশবে প্রাপ্ত ইসলামী শিক্ষায় যে ঘাটতি ঘটেছিল [illegible] পূরণ হল স্যার সৈয়দ এর সংস্পর্শে এসে লাভ করলেন যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞান [illegible] ধর্ম-বিশ্বাস। এক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ হলেন তাঁর যথার্থ শিক্ষাগুরু।

[illegible] পত্রিকা প্রকাশনা ক্ষেত্রে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন যাদের দ্বারা তাঁদের [illegible] তাঁর জীবনে বিশেষ অবদান রেখে গেছে। "আল নাদওয়া" পত্রিকা প্রকাশ [illegible] কাজে তিনি সহায়তা পান শিবলীর কাছ থেকে। তিনি তাঁর দ্বারা এতখানি [illegible] হয়েছিলেন যে, "আল নাদওয়া" সম্পাদনাকালে তিনি অমৃতসর থেকে সেখ [illegible] মুহম্মদের পত্রিকা "ওয়াকিল" সম্পাদনা করার ডাক পেয়েও তিনি মৌলানা [illegible] কে ছেড়ে যেতে পারেননি। পরে অবশ্য তিনি এই পত্রিকার কাজ করার সিদ্ধান্ত [illegible] এবং পত্রিকার কাজ করাকালে ও পরবর্তী সময়ে তাঁর মধ্যে নিজস্ব রাজনৈতিক [illegible] সূচনা ঘটে।

[illegible] তখন একুশ অথবা বাইশ। সে সময় একটি প্রেমের ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে [illegible] প্রেমে ব্যর্থতার কারণে তাঁর হৃদয়ে ফিরে এসেছিল হারানো ঈশ্বর বিশ্বাস। [illegible] প্রদর্শিত পথে নয়, ফিরে গেলেন তিনি ধর্মের পথে নিজে নিজে। নিজের উদার [illegible] তিনি কোন সময়েই হারাননি জীবনে। এই সময়েও নয়। বরং তা আরও দৃঢ় হল

ঈশ্বর বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর। তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ক চিন্তায় সু
হলেন। ১৯০৯ সালের শেষে ঈশ্বর বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার পর শুরু হল তাঁর জনজী
১৯১০-১৯১১ সালে। তাঁর "আল হিলাল" পত্রিকা ১৯১২ সালে প্রকাশিত হবার
আড়াই বছর চলে মুসলিম জনজীবনে যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। তারপর তি
"আল বালম" প্রকাশ করেন, চারমাস ছিল যার আয়ুষ্কাল। "আল হিলাল" পত্রি
সম্পাদক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন এবং এই পত্রিকার জন্য প্রধান কাজগুলি ক
দিতেন আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী। সংক্ষিপ্ত সময়কাল চললেও পত্রিকাটি
জনপ্রিয় হয়। এই পত্রিকার সমকালীন জীবনধারায় সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি ইসলা
ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস গ্রহণ করেন। ১৯১২-১৯২০ সালে মুসলিম রাজনীতি
আলোড়ন সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই পত্রিকার জন্য। এই পত্রিকা কে
পত্রিকামাত্র ছিল না, ছিল একটি বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ — এই বিশ্বাস তিনি পো
করলেও সেটিকে তিনি বিশ্বাস্য স্পষ্টরূপ দিতে পারেন নি। তিনি তৎকালীন মুস
জনমানসে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কোরানের নির্দেশাবলী মেনে সব কি
তিনি ইসলামের ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া ধর্মগুরু
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী- উভয়কেই আক্রমণ করে বসলেন। তিনি বলে
ধর্মের দোকানদারগণ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের নাম দিয়েছেন 'ধর্ম'। অপরদি
আলোকিত দর্শন চিন্তা ও আধুনিক গবেষণা নিরীশ্বরবাদ ও মুক্ত চিন্তাকে প্রজ
ইজাতিহাদের ছদ্মবেশে ভূষিত করেছে।

আজাদকে কারাগারে বন্ধ হতে হল। সাড়ে তিন বছর জেলবাসের পর তিনি
পেলেন ১৯১৯ সালে। ১৯২০ সালে তিনি মালিহাবাদীকে বললেন, মুসলিম
তাঁকে একজন ইমাম হিসাবে মেনে নিলে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে চুক্তির সিদ্ধান্ত
করবেন এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন। তাঁর দৃঢ় বি
হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে মুক্তি এনে দেবে। তিনি এসময় খিল
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই আন্দোলনই স্বাধী
লাভের উপায়। এই আন্দোলন চার বছরে শক্তি লাভ করে এবং ইতিহাসে গুরু
স্থান দখল করে নেয়। আজাদ বস্তুত জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী ধর্মাদেশের স
করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ইসলামী ধ্যান ধারণার পরিম
রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং সেভাবে ভারতীয় মুসলমানদের ভবি
গড়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তিনি সফল হননি। তাঁর স্বপ্ন চূর্ণ হয়।

১৯১২ সালে আজাদের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ ঘটে। এই সময় অখণ্ড অবসর

তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের স্বপ্নে বিভোর হলেন। সমগ্র ভারতবাসী হবে এক [illegible] দেশের নাগরিক স্থান -ধর্ম নির্বিশেষে - এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার [illegible] বিষয়। হিন্দু মুসলিম ঐক্য হবে জাতীয় ঐক্যের সেতু এবং অহিংসাই হল স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ- একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসে [illegible] ভূমিকা নিলেন আজাদ। "আল হিলাল" এর চিন্তায় ছেদ পড়ল। ভারতীয় [illegible]দের ইমাম হওয়ার বাসনা বর্জিত হল। তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটল যে পরিবর্তন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহনের ফলে সম্ভব হয়েছিল।

[illegible] দল ভুক্ত হয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করা সম্পর্কে অবিচল [illegible] নিয়ে এগিয়ে চললেন। ১৯৩৭ সালের শেষদিকে রচনা করলেন "তার্জুমান [illegible]- কোরআন" এবং দুটি খণ্ডে প্রকাশ করলেন। তিনি মনে করলেন, কোরআনকে [illegible] দরজা খুলে দেওয়া নামক পবিত্র কর্তব্য তিনি সম্পন্ন করলেন এবং আত্মতৃপ্তি [illegible] করলেন।

[illegible] সালে তিনি হলেন কংগ্রেসের মুসলিম নেতা। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের [illegible] নির্বাচিত হলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি রাজনৈতিক [illegible] সক্রিয় হলেন। এই সময় জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তানের দাবি উচ্চ রোল তুলল এবং [illegible] আক্রমণের প্রধান শিকার হলেন আজাদ। তিনি 'ইসলামের অসাধু বিশ্বাসঘাতক' [illegible] 'হিন্দুদের প্রতিনিধি' বলে গণ্য হলেন। তথাপি আজাদ কংগ্রেসকে সমর্থন করে [illegible] দাবি অস্বীকার করলেন দৃঢ়চিত্তে। তিনি বললেন, ইসলাম একটি গোটা [illegible] ভিত্তি হতে পারে না কেননা, বিভিন্ন বিষয়ে অনৈক্য কেবল ধর্মের মিল দিয়ে দূর [illegible] না। তারপর অবশ্য দেশভাগের পর পাকিস্তানকে তিনি ঘটনা বলে মেনে নেন [illegible] পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয় রাষ্ট্র পাশাপাশি সৌহার্দ্য বজায় রেখে নিজের নিজের [illegible] চলুক- এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অভিজ্ঞতাই তাঁকে এভাবে নিজের চিন্তাধারা [illegible] করতে শিক্ষা দিয়েছিল।

[illegible] প্রাক্কালে তিনি লিখলেন, 'গুবার-ই-খাতির' যেটি তাঁর পরিণত চিন্তা [illegible] ফসল। স্মৃতিচারণ করলেন জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যার মধ্যে চব্বিশটি [illegible] সংগৃহীত হয়েছে যেগুলিতে আমাদের চরিত্রের স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতা লাভের প্রত্যুষকালে ১৯৪৫ সালে আজাদ আহমেদনগর দুর্গ থেকে ছাড়া [illegible] এবং ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিবিদ হিসেবে সক্রিয় থেকেছিলেন। [illegible] 'India wins Freedom' গ্রন্থে তার বর্ণনা মেলে। আজাদ তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মা

দিয়ে যা কামনা করেছিলেন, তা ঘটেনি। তাঁর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হ
গেল। ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু দুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল তাঁর স্বদেশ। তবু তিনি
মেনে নিলেন। তবে অন্তরে নয়, বাইরে -কেবলি বাইরে। তিনি বুঝলেন অন্তর্কল
দীন জাতির ভাগ্যে যা ঘটবার তা ঘটেছে। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে এ
তিনি সেই লক্ষ্য নিয়ে কর্মে মনোনিবেশ করলেন। একদিকে দেশভাগের মর্মঘা
বেদনা অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের আনন্দ-দুয়ের মধ্যে প্রথমটিই তাঁর -- বেজেছি
অধিক। তবু তিনি আপন কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে স্থির সংকল্প হলেন। যা ঘটে গেছে
নিয়ে বিলাপ করে কাল কাটানোর মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি বললে
'The situation was one in which tragedy and comedy we
inexplicably mixed.' একটি যে বিদ্বেষের কাঁটা ভ্রান্তি রূপে আজও দেশবাসী
মনের মাঝে বিঁধে রয়েছে তাকে তিনি দেশভাগের পরপরই উপড়ে ফেলা
চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন গভীর বিশ্বাসে, "The Muslim Leagu
enjoyed the support of many Indian Muslims but there was
large section in the community who lead always opposed th
League" – তিনি বলেছিলেন, দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কংগ্রেসে
কার্যকরী সমিতিতে এবং মুসলিমলিগের 'Register' এ। দেশবাসী এই কাঁটা ছেঁ
সমর্থন করেননি। বাস্তব সত্য হল তিনি বলেন, 'In fact their heart and so
rebelled against the very idea" । তাঁর নিজের মনেও সেই প্রকাশ বিদ্রে
পুঞ্জীভূত হয়েছিল। কিন্তু বহুক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও তিনি দেশভাগের মতো নি
প্রিয় পক্ষে ধ্বংসসাধক সিদ্ধান্তটিকে বাতিল করতে সফল হননি। তাঁর মতানুযায়ী ত
যা ঘটার তাই ঘটে গেল।

দেশস্বাধীন হওয়ার পর তিনি হলেন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এবং আমৃত্যু সেই প
থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন সাধন করে গেছেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়। দী
এগারো বছর তিনি এক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তিনিও তাঁ
সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশন গ
করতে এবং ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অ
উচ্চশিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থাৎ মধ্যবর্তীস্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব অব্যব
সেসময় ছিল সেগুলি দূর করে সুশৃঙ্খলা আনাই ছিল এই দুটি কমিশন গঠনের গঠনে
মূল লক্ষ্য। স্বদেশে কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা জরুরী বিবেচনা ক
তিনি কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে আই. আই. টি স্থাপন করেন। খড়গপুরে
আই.আই.টি সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান যেটি দেশে পরবর্তী সময়ে সমধি

[illegible] করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে অনুদান দেওয়া সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন [illegible] জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করেন। বিদেশের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতি [illegible] প্রদান করার জন্য Indian Council of cultural Relations গড়ে [illegible] এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য ব্যাঙ্গালোরে Indian [illegible]ute of science প্রসারকরণও তাঁর অন্যতম অবদান, শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে। [illegible] Advisory Board of Education কে পুণর্গঠন করার কৃতিত্বেরও তিনি [illegible]। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য Scientific Man Power [illegible]unity গঠন করেন যার ফলে ভারত আজ এক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে পেরেছে [illegible] খ্যাতি এক্ষেত্রে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক এবং [illegible] উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন একাদেমি গঠন এবং National Book [illegible] এর মতো প্রতিষ্ঠান গঠন করে তিনি উল্লেখযোগ্য কর্মকীর্তির নিদর্শন রেখে [illegible] কবিগুরু স্বপ্নের বিশ্বভারতীকে তিনি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি [illegible] প্রতি জাতীয় ঋণ স্বীকার করার উদাহরণ নির্ধারিণ করে গেছেন। তদুপরি [illegible] আজাদ স্বাধীনতা লাভের পরই শিক্ষামন্ত্রক দিল্লিতে যে শিক্ষা সম্মেলনের [illegible] সেই সম্মেলনে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর [illegible] কর্মে রূপ দেওয়ার জন্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে সম্পাদক [illegible] হয় এবং দুটি খণ্ডে 'History of Philosophy – Eastern and [illegible]' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র [illegible] আলোচনা করার জন্য এই প্রকার প্রয়াস তিনি গ্রহণ করেন। আজাদ [illegible] অসামান্য গ্রন্থের ভূমিকা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দর্শানানুরাগী মনের [illegible] তুলে ধরেছে। সেই ভূমিকায় তিনি লেখেন, "এই বিশ্ব হল এক প্রাচীন [illegible] যার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠাগুলি হারিয়ে গেছে। এ গ্রন্থের সূচনা কেমনভাবে [illegible] তা আর এখন বলা সম্ভব নয়, আর আমরা এও জানি না এর সমাপ্তি কিভাবে [illegible]" [শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, [illegible]দের সন্ধানে) পৃ. ২৫১] এই আজাদ দার্শনিকও বটে।

[illegible] হিসেবেও তাঁর ব্যর্থতা একটি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় - সংবিধানে ঘোষিত চৌদ্দ বছর [illegible] শিক্ষার্থীদের বিল ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা নামক [illegible] রূপায়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতাকে [illegible] স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং তার কারণও নির্দেশ করে গেছেন - তিনি [illegible] ব্যবস্থাপনাকে নতুন জেলখানা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সেখানে তিনি [illegible] বন্দির জীবন যাপন করে ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।

আজাদের পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি। বারো অথবা তেরো বছর বছর ব
বিয়ে হয় আট বছর বয়সী জুলেখার সঙ্গে, ১৯০১ সালে। স্ত্রী সম্পর্কে কে
তিনি বলেননি। ১৯৪৩ সালে তাঁর স্ত্রীর জীবনের শেষ দিনটিতেও পাশে
পারেননি। একটি পুত্র সন্তানকেও তাঁরা তার মাত্র চার বছর বয়সে হারান।
মানবিক প্রেমশূন্য পারিবারিক জীবন তিনি যাপন করেছিলেন। তাই বলে তাঁ
কোমল রসের অভাব ছিল না। গভীর রাতে যমুনার তীরে বসে তিনি সেতা
জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের ও সুরের আস্বাদনে বিভোর হতে ভালোবাসতেন।
সত্তার পরিচয়ও গোপনেই থেকে গেছে। প্রকৃত মানুষটিকে চেনা-জানা
কাছে সম্ভব হয়নি। সে অর্থে তাঁর জীবন গৌরবময় হয়নি। জীবনের প্রতিক্ষে
তাঁর সঙ্গী হয়েছে। তবু একটি পরিচয় তাঁর অমলিন হয়ে রয়েছে-তিনি এক
দেশপ্রেমিক এবং অপরাজিত সৈনিক।

১৯৫৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই অনন্য দেশসেবকের জীবনাবসান ঘটে

* লেখিকা অবসরপ্রাপ্ত দর্শনের অধ্যাপিকা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

সুকুমার রায় ও আবোল তাবোল

অদিতি ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

...ভোলা খেয়াল খোলা /স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়, /আয়রে পাগল আবোল ...মত মাদল বাজিয়ে আয়। .....আজগুবী চাল বেঠিক বেতাল/ মাতবি মাতাল ...আয়রে তবে ভুলের ভবে /অসম্ভবের ছন্দেতে।"

...তাবোল' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই সুকুমার রায় আমাদের জানিয়ে ...সবরকম সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে ভোলানাথের খেয়াল রঙ্গে মাতাল ...এক অসম্ভবের ছন্দে মাতবেন তিনি। এই কবিতাগুলোর মধ্যে দিয়ে আজগুবি আর ...এক জগতে আমাদের নিয়ে যান তিনি, সুকুমারের এই আবোল তাবোল বা ...অনেক সময় লিয়র বা ক্যারলের সাথে তুলনা করা হয়, কিন্তু সুকুমার ...শিশুর ননসেন্সের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর ননসেন্স কবিতাগুলি ...অর্থহীন নয় — আবোল তাবোল মজাদার শব্দের মাঝ দিয়ে উঁকি মারে ...গভীর সত্য যা শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের।

...সুকুমারের এ জাতীয় সৃষ্টি কি কোনো হঠাৎ খেয়াল? আসলে যে কোনো ...শিল্পেই থাকে অন্য আর এক নির্মাণ যার বীজ উপ্ত হয় শিশু মনে। এ প্রসঙ্গে ...মেজোবোন পুণ্যলতা লিখছেন: " ছোটবেলা থেকেই দাদাও চমৎকার গল্প ...পারত। বাবার প্রকাণ্ড একটা বই থেকে নানা জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনি ...বোন শান্তিলতা), মণি (সুবিনয়) আর আমাকে আশ্চর্য আর মজার গল্প বলত।"[১] ...গল্প বলার ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে। ...উপেন্দ্রকিশোরের এই ক্ষমতার সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠকদের সকলেরই পরিচয় ...শুধু গল্প বলার ক্ষমতাই নয় মজার মজার ছবি আঁকার সহজাত ক্ষমতাও সুকুমার ...কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের নিরস পাতাগুলি ...ছবিতে ভরিয়ে ফেলতেন ছোট্ট সুকুমার।

...বড় উঠেছিলেন যে পরিবেশে তা তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে বিকশিত করার ...একান্তভাবে সহায়ক। শ্রদ্ধেয়া লীলা মজুমদার তাঁর লেখা 'সুকুমার' গ্রন্থে ...ভাবে বর্ণনা করেছেন কোন্ পরিবেশে সুকুমার বড় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ...: 'বয়স তখনও ত্রিশের নীচে, তারই মধ্যে কোন্ যাদুবলে উপেন্দ্রকিশোর ...ছেলেমেয়ে বড় করে তুলবার নিয়মটি বুঝে নিয়েছিলেন। ঘরের সামনে চওড়া

বারান্দায় রোজ বিকেলে আসর বসত, ছোটো বড়ো সকলে যোগ দিত ; গান, গল্প, ধাঁধা ও বিজ্ঞানের কথা কিছু বাদ যেত না। সকলেই একতলার স্কুলে লিখতে প শিখত। উৎসব, অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণের জন্য গান, আবৃত্তির মহড়া চলত শুধুমাত্র এটুকুই নয়, উপেন্দ্রকিশোরের একটা যন্ত্রপাতির ঘর ছিল — সে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে দূরবীণের সাহায্যে চাঁদ তারা দেখাতেন। অনুবীক্ষ সাহায্যে নানাধরণের পোকামাকড় চিনিয়ে দিতেন। তাছাড়া মাঝে মাঝেই সকলে বেঁধে যাওয়া হত চিড়িয়াখানায়, জাদুঘরে — নিজের চোখে জীবজন্তু, প্রাগৈতিহ যুগের প্রাণী ইত্যাদি জানবার, চেনবার, তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হবার সমস্ত রসদ যুগিয়ে দিতেন। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে জানবার শু একটা আগ্রহ জেগে উঠতো ছেলেমেয়েদের মনে।

শিশুবয়সে যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে মানুষ তার ছাপ থেকে যায় তার ব্যক্তি কথাবার্তায়, চলনে বলনে। হাসিখুশি ভরা এক অদ্ভুত আনন্দময় পরিবেশে উঠেছিলেন সুকুমার তাই তাঁর ব্যক্তিত্বে এক সরস আনন্দময়তা ছিল। সাহি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুকুমার সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলছেন ' আনন্দময়তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি বন্ধুমজলিসে আনন্দের কেন্দ্র হই এবং যাহা কিছু রচনা করিতেন তাহা আনন্দে অভিষিক্ত হইত।" এক অদ্ভুত রস নিয়েই জন্মেছিলেন সুকুমার — এই রসবোধ অনুশীলনসাপেক্ষ নয়, সহজাত। সমস্ত রচনাতে তাঁর এই রসিক মনটি ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতা, গান, ছবি সমস্ত মধ্যেই হাসি থাকতো, আনন্দ থাকতো, কিন্তু কোথাও কোনো বিদ্রূপ থাকতো ন পড়ে, দেখে, শুনে সকলেই আনন্দ পেত, কখনো আঘাত পেত না। আর একটা সুকুমারের হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে ছেলে বুড়ো সকলের জন্যই। আ তাবোলের কবিতাগুলি শুধু ছোটোদেরই আনন্দ দেয় না, বড়দের মনকেও সমান স্পর্শ করে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে সুকুমারের কবিতাগুলিতে খেয়ালরসের মাতলামি নেই, আছে একটা গভীর ব্যঞ্জনা যা নিয়মের নিগড়ে আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির অসারতাকে ফুটিয়ে তোলে। এই বিষয়টা বু গেলে আমাদের একটু ভাল করে ফিরে দেখতে হবে 'আবোল তাবো কবিতাগুলোর দিকে।

শিক্ষাকে জীবনের সাথে যুক্ত করে শিশুর আগ্রহ ও কৌতূহল বৃত্তিকে জাগিয়ে তু না পারলে শিক্ষা যে কতখানি নিরস ও বিরক্তিকর হতে পারে সে ব্যাপারে সু বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। হয়তো ছোটোবেলায়, অন্য রকম শিক্ষার

[illegible] লেন বলেই নিছক পুঁথিগত শিক্ষার অপূর্ণতা, শিক্ষণ পদ্ধতির যান্ত্রিকতা তাঁকে [illegible] করেছে। তাই দেখি '**বুঝিয়ে বলা**' কবিতায় অনিচ্ছুক ছাত্রকে জোর করে পড়া [illegible] যে কায়দা তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন 'না বুঝবি তো মগজে তোর [illegible] গোঁজাব'। অর্থাৎ যেনতেন প্রকারেণ মগজে গুঁজে দিলেই শিক্ষা দেওয়া [illegible] — এতে আনন্দ, ভালবাসার কোনো স্থান নেই। বইগুলো যে 'মুটের বোঝা' [illegible] কবি ভোলেন নি। '**নোটবই**' কবিতায় দেখি নোটবই ভরে উঠছে জগতের [illegible] সম্পর্কে শুধু নানাধরনের তথ্যে যার মধ্যে কোনো গভীরতা নেই, নেই [illegible] জ্ঞানের রসদ। '**বিজ্ঞান শিক্ষা**' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন অসার [illegible] বিজ্ঞান-শিক্ষা দেবার কি অদ্ভুত প্রয়াস। বিজ্ঞানের কতকগুলো 'শব্দ' যাদের [illegible] জানবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই তা কায়দা করে ছাত্রের মগজে [illegible] মাথা ঘুরিয়ে দিতে হবে ''মুণ্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট' [illegible] 'ভেলসিটি' কষে, দেখি মাথা ঘোরে কিনা ঘোরে।" এই কবিতাগুলো [illegible] কি মনে পড়ে যায় না আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যে নিরন্তর তথ্য সর্বস্ব [illegible] শিক্ষা দিয়ে চলেছি তার কথা? ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যে স্কুল ব্যাগ [illegible] তা কি 'মুটের বোঝা' ছাড়া অন্য কিছু?

[illegible] কবিতায় পাত্রের রূপ গুণের অপরূপ বর্ণনা শুনে কন্যার ভবিষ্যতের কথা [illegible] শিহরিত হতে হয়। কিন্তু যিনি বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন তিনি [illegible] নির্বিকার, বরং তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা 'কিন্তু তারা উচ্চঘর,/ কংসরাজের [illegible] লাহিড়ী বনগ্রামের/ কি যেন হয় গঙ্গারামের,/ যাহোক্, এবার পাত্র [illegible] কি আর মন্দ ছেলে?'। অর্থাৎ ছেলে যাই হোক্ না কেন, 'প্যাঁচার মতন [illegible] হোক্, বা 'উনিশবার ম্যাট্রিকে' ঘায়েলই হোক্ তাতে কি এসে যায়? তার [illegible] জন্যেই সে পাত্রী পক্ষের কাছে আদরণীয়। তৎকালীন সমাজ প্রচলিত [illegible] বোধকে রীতিমতো বিদ্রূপ করেছেন সুকুমার এখানে।

[illegible]'-এর কথা মনে আছে তো? চণ্ডীদাসের খুড়ো এক আজব কল [illegible] — "সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি —/ মণ্ডা মিঠাই চপ্ [illegible] কিংবা লুচি।/ মন বলে 'তায় যাব খাব',/ মুখ চলে তায় খেতে;/মুখের [illegible] ছোটে পাল্লা দিয়ে খেতে।/ এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে [illegible] হুঁস রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।" লোভের বস্তু সামনে থাকলে [illegible] ছুটে চলার যে তাড়না সেই সত্যকেই সুকুমার এখানে তুলে ধরেছেন।

আজকের এই বস্তু সর্ব্বস্ব দুনিয়ায় কাম্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য মানুষের যে নিরন্তর
চলা সে কথাই কি মনে পড়ে যায় না '**খুড়োরকল**' কবিতাটি পড়লে?

'সিংহাসনে বসলো রাজা বাজলো কাঁসর ঘন্টা,/ছট্‌ফটিয়ে উঠলো কেঁপে মন্ত্রীর
মনটা'। — '**গন্ধ বিচার**' কবিতায় সুকুমার দেখিয়েছেন রাজা রাজড়ার খেয়াল কি
হতে পারে। উদ্ভট খেয়াল পূরণ করার জন্য যাকে যে কোনো হুকুম দিতে পারেন
আর সেই ভয়ে সবাই কম্পমান। গন্ধ বিচার করতে বলায় বদ্যি, কোটাল এমনকি
পালোয়ান ভীমসিং এর পর্য্যন্ত ভয়ে গা ঝিম্‌ঝিম্ করে। রাজার খেয়ালে যে কত
হয়ে যেতে পারে তা তো আমার অহরহ আমাদের পরিচিত জগতে প্রত্যক্ষ করি।
তেমনই '**গোঁফ চুরি**' কবিতায় দিব্যি ভালমানুষ বড়বাবু হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন তাঁর
গোঁফ চুরি হয়ে গেছে। সবাই শশব্যস্ত — কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কি
বড়বাবুকে বোঝানো যাচ্ছে না গোঁফ কক্ষনো চুরি যেতে পারে না। ভয়ানক রেগে
বাবু বলেন "নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা, এমন গোঁফ তো
জানি শ্যামবাবুদের গয়লা। 'এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই' —
না বলে জরিমানা করলেন তিনি সবায়"। অদ্ভুত খেয়াল চাপলো মাথায় অ
কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্তই শুধু করলেন না জরিমানাও করে দিলেন। উ
কর্তৃপক্ষের এরকম খামখেয়ালী ইচ্ছার বলি কি মাঝে মাঝেই হ'ন না অ
কর্মচারীরা?

সুকুমার ছিল ঋজু চরিত্রের মানুষ আর সেই কারণেই চারপাশের মানুষগু
স্বভাবজাত অসংগতি খুব সহজেই ধরা পড়তো তাঁর চোখে। আর তার প্রতিফল
বিভিন্ন রচনায় বিশেষতঃ আবোল তাবোলের কবিতাগুলোতে। তাই দেখি
প্রতিবাদ করেছেন ছায়াবাজির বিরুদ্ধে — "আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যি
কথা — / ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্র হল ব্যাথা"। সত্যের মুখোমুখি হতে
সর্বদাই ভয় তাই লড়ি ছায়ার সঙ্গে। '**হাত গণনা**' কবিতাতে সুকুমার তুলে ধ
দুর্বল চরিত্রের সেইসব মানুষদের যাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস নেই। জ্যো
ভাগ্য বিচারের ফলে দেখা গেল দিব্যি হাসিখুশি মানুষটা হঠাৎ ভবিষ্যৎ চিন্তায়
হয়ে ওঠে — "কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা — এই বলে সে
কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।'

অনাবিল আনন্দ আর হাসিখুশি সহজ পরিবেশে বেড়ে ওঠা সুকুমার মজা ক
গম্ভীর প্রকৃতির হাসতে না পারা মানুষগুলোকে নিয়ে তাঁর '**হুকোমুখো হ্যাংলা**

'আবোল-তাবোল-এর আলোচনা করতে গিয়ে এই বই এর শেষ কবিতাটির সম্ কিছু না বললে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মা বছর বয়সে সুকুমার হাসি খুশি ভরা তাঁর সুন্দর জগৎ ছেড়ে সকলকে কাঁদিয়ে নেন। আবোল তাবোল-এর শেষ কবিতাটাই সম্ভবত তাঁর শেষ রচনা। এই কবিতাটিরও নাম দিয়েছেন তিনি **'আবোল তাবোল'**। কবি জানেন মৃত্যু পা গুণে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে — আর কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের রশিটা খুলে নেবে তাই এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে কবি প্রাণপনে বেঁচে নিয়েছেন কবিতায়। তিনি নিজেকে খেয়াল স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন — " আজকে দাদা আগে / বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে / নাই বা তাহার অর্থ হোক্ / নাই বা বুঝুক লোক।" কবি জানেন যেখানে যা কিছু অলীক কল্পনা সেখানেই রয়েছে প্রকৃত প্র তাগিদ। তিনি বলছেন তাঁর 'মনের মাঝে ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে'। Fantasy এসে গ্রাস করে কবির চেতনাকে 'শূন্যে ঠ্যাং তোলা হ্যাঙ্গলা হ মক্কিরাণী পক্ষীরাজ', 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' সব এসে ভিড় করে তাঁর চো সামনে। রূপকথার সব গল্পগুলো অল্প অল্প ছবি আঁকে কবির চেতনার ক্যানভাসে গল্প শুনে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দস্যি ছেলেও। কবির দস্যিপনাও থেমে যাবার হয়ে এসেছে — "ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,/গানের পালা সঙ্গে মোর।" নিয়মের দাস — সে নিয়মে বাঁচে নিয়মে মরে। মরণ যখন অনিবার্য তখন তাকে টেনে নিয়ে কবি তাঁর এই শেষ কবিতায় মৃত্যুর অমোঘতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন।

সুকুমারের ১২৫ জন্মবর্ষে তাঁর রচনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয় যত অতিক্রান্ত হচ্ছে, যত সমাজে জটিলতা বাড়ছে তাঁর রচনা যেন ততটাই বেশি পরি হয়ে উঠছে প্রাসঙ্গিক। তাঁকে শুধুমাত্র শিশু সাহিত্যিকের তকমা এঁটে দেওয়া যা ছেলেবুড়ো সবার কাছেই তিনি সমানভাবে আদরণীয়। তাই দেশকালের সী ছাড়িয়ে তিনি কালজয়ী এবং আধুনিক। স্বপ্ন দোলা হাওয়ায় দুলিয়ে, সুরের নে মাতিয়ে মাতাল হয়ে, খেয়াল রসে কলম ডুবিয়ে যে সৃষ্টি তিনি করে গেছেন তা তাঁর জীবনরসিকের পক্ষেই সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) 'সুকুমার' লীলা মজুমদার। প্রকাশনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডমি

২) সুকুমার গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড।

Our homage to
Kamalkumar Majumdar
and
Adwaita Mallabarman
for their Birth Centenary

কথাসাহিত্যিক কমলকুমার ঃ নানা সমালোচকের চোখে

ডঃ চিত্রিতা দত্ত
অধ্যাপিকা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

[illegible] নভেম্বর ১৯১৪ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১, ১লা অগ্রহায়ণ) খৃঃ কমলকুমার মজুমদারের [illegible] হয়েছেন ১৯৭৯, নয় ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ জন্মসাল থেকে ধরলে প্রায় একশো [illegible] ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, তবু শিল্পী হিসেবে তাঁর অবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে [illegible] যে জিজ্ঞাসা, বিতর্ক, উন্নাসিকতার আবার সশ্রদ্ধ আন্তরিক অনুভবে তাঁকে ছুঁতে [illegible] প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল তা এখনো অব্যাহত, পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত আর তা থেকে [illegible] নানা জিজ্ঞাসার উত্তর, উঠে আসছে আরো আরো জিজ্ঞাসা যার উত্তর দেবে [illegible] সাহিত্যিক ও শিল্প রসিকরা। শিল্প সন্ধানীরা গবেষণা চালাবে, সরল-বঙ্কিম [illegible] নানা বিশ্লেষণে ভরে উঠবে সমালোচকের কলম। কিন্তু কথা একটাই যে [illegible] চর্চা অব্যাহত থাকবে। তা অপরিহার্য জায়গা জুড়ে থাকবে বাংলা সাহিত্য ও [illegible]। বরং প্রায় শতবর্ষ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা আরো জরুরী। এ কারণে [illegible] যাওয়া সমাজ-যাপন-মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে তিনি কতটা সমকালীন এবং [illegible], কতটা দেশীয় এবং আন্তজাতিক,কতটা এলিট এবং আমজনতার, আর কতটাই [illegible] পারেন ব্যক্তি কমলকুমার ও তাঁর সাহিত্য-শিল্পের নতুন নতুন পাঠে-ব্যাখ্যায় [illegible] আগ্রহী করে তুলতে। এইনয় যে একশ বছরের পূর্তি সূত্রেই তিনি আলোচনার [illegible], প্রকৃতপক্ষে একশ বছরকে একটা মাইল ফলক ধরা যেতে পারে, যে [illegible] শিল্পীর একবার নতুন করে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সময় [illegible]

[illegible] ছোটগল্প লিখেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন [illegible] ফরাসী ভাষা শুধু জানতেনই না রীতিমত চর্চা [illegible] ছিল। আঁকার হাততো অনবদ্য, চলচ্চিত্র ভাবনার [illegible] রসিক ও আড্ডাবাজ, কলকাতা বিশেষজ্ঞ, নানা [illegible] ডিজাইন করেছেন গয়নারও। পত্রিকা সম্পাদনা [illegible] মাত্র পেয়েছিল। ইতিহাসের তাঁরই [illegible] এবং জীবিকার কারণে বেশ কিছুদিন ব্যবসা বাণিজ্য এবং পরে শিক্ষকতাও [illegible]। প্রথা মাফিক লেখাপড়াটা খুব বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের রাজ্যে ছিল [illegible] বিচরণ। হাসি ঠাট্টা রসিকতায় মাতিয়ে রাখতেন নানা ধরনের মানুষকে। [illegible] সেই রসিকতা নিতে পারা এক সহ্য করতে পারাটাও কম কথা ছিলনা। সব

মিলিয়ে কমলকুমার একটি স্বতন্ত্র ঘরানা। কমলকুমারকে বুঝতে গেলে, অন্ততঃ বু
চেষ্টা করতে হলে শুধু সাহিত্যিক বা চিত্রশিল্পী হিসেবে না দেখে তাঁর ব্যক্তিত্ব
প্রতিভার যত আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে সবকটির প্রেক্ষিতে তাঁকে দেখতে হবে
সংঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে মানুষটির জীবন ও ব্যক্তিত্বের নানা ডাইমেনসন্। সমসাম
কাল এই জাতীয় শিল্প প্রতিভাকে প্রায়শঃই ততখানি মূল্যায়ন করে উঠতে পারেনা
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসায়, সেইজন্য তাঁকে নিয়ে এযাবৎকাল যত আলাপ আলে
ভাবনা-গবেষণা হয়েছে তা থেকে কিছু আলোচনার প্রেক্ষিতে কমলকুমারকে এক
ফিরে দেখতে, শতবর্ষের প্রেক্ষিতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও অবস্থানকে আর একটু
নিতে এই প্রয়াস।

কমলকুমারকে নিয়ে যে সব জিজ্ঞাসা চলে আসছে, সেগুলোকে আমরা মোটা
এইভাবে দেখতে পারি;

১) কমলকুমার কি বাস্তবিক অর্থে খুব দুর্বোধ্য? নাকি কোনো কারণে এ
দুর্বোধ্যতার সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন বিগতকাল ও সমকালের অন্যান্য
সাহিত্যিক থেকে আলাদা হওয়ার জন্য?

২) কমলকুমার কি এমন একটি পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন যেটা
ছোট কিন্তু একান্তভাবে কমলকুমারীয়?

৩) তাঁর আগে তাঁর সময়ে যে ভঙ্গিতে বাঙলা গদ্যের চর্চা হচ্ছিল, সঠিক
প্রকাশের জন্য কমলকুমার কি তাকে যথার্থ মনে করেননি?

৪) কখনো কথ্যভাষা, কখনো সাধুগদ্য, কখনো আবার গুরুচণ্ডাল ব্যবহার করে
কি একটা নতুন ভাষারীতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন?

৫) তিনি কি চেয়েছিলেন তাঁর পাঠক হবেন দীক্ষিত পাঠক?

৬) সাধু বাংলায় গল্প উপন্যাস লিখলেও প্রবন্ধ-সমালোচনা কিন্তু সবসময়
ভাষায় লিখতেন। এই ধরনের একটা ব্যবধান রক্ষা করার কারণ কোথায়
ছিল?

৭) কমলকুমারের গদ্যে অন্তর্জগত থেকে কি এক ধরনের কাব্যিকতার স্বাদ
যেত? নাকি তাঁর গদ্যভঙ্গি কখনোই কাব্যধর্মী ছিলনা?

[illegible] ভারতে তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল, কমলকুমার কি 'ভারতীয় [illegible]তার অন্তর্দ্বন্দ্বের অতি উৎকৃষ্ট' উদাহরণ?

[illegible] মানেই কি একই সঙ্গে এলিটিজম্ এবং সাধারণত্ব?

[illegible] বিশেষজ্ঞ কমলকুমার কি মূলতঃ ফরাসী গদ্যের রীতিতে বাগ্ বিন্যাস [illegible] ছিলেন তাঁর 'রচনায়'?

[illegible] কমলকুমারের রচনার নানা পাঠ ও ভাষ্য সম্ভব এবং প্রয়োজন?

[illegible] তাঁর অনন্যতা কি তাঁর সাহিত্যে বর্ণের ব্যবহার ও শিল্পীর তুলি চালনার [illegible] তুলে এনেছে?

[illegible] যে প্রশ্নটা আমাদের মনে বারবার উঠে আসে সেটি হল কমলকুমারের [illegible], কোথায় তিনি সকলের চেয়ে আলাদা।

[illegible] সাহিত্যরীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর [illegible] উপন্যাস সমগ্র' এর ভূমিকায় বলেছেন, "তাঁর ভাষা শুধু সাধু বাংলা নয়, [illegible] একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যে সাবলীল ঝক্‌মকে চলিত ভাষাও লিখতে [illegible] অনেক নিদর্শন আছে। বড় পত্র-পত্রিকায় শিল্প সমালোচনায় এবং নানা [illegible] লিখতেন চলিত ভাষায়। কমলকুমারের বয়সী অনেক লেখকই সাধু বাংলা [illegible] করে চলে এসেছিলেন চলিত ভাষায়, দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন [illegible] কিন্তু কমলকুমার সাধু ও চলিত এই দুটি ভাষাই পোষণ করেছেন। অর্থাৎ [illegible] ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ চিন্তা ছিল। এ ভাষার দায় নেই সহজ [illegible], এ শিল্প নির্মাণের ভাষা যে কোনো উচ্চাঙ্গ শিল্পের মতনই এর রস গ্রহণ করার [illegible] দীক্ষিত হতে হবে। যেহেতু কমলকুমারের ভাষার আর কোনো পূর্ব [illegible] কোনো লেখকের সঙ্গে তাঁর ভাষার তুলনা চলেনা, তাই কমলকুমারের [illegible] বার বার পড়তে হয়।

[illegible] সমগোত্রীয় পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করবেন বলেই যেন কমলকুমারের [illegible]"

[illegible] পরম্পরাকে উল্টে পাল্টে দিয়ে বাক্যকে তিনি ঘোলা করে দিতে সিদ্ধ [illegible] ক্ষেতে ভাত দিতে ফজলের বাপকে সংগে সেই ন্যাংটো ছেলেটা বয়স [illegible], গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখনও সে তার মাই খায়"। "সে সবই দ্যাখে,

কিন্তু ফজল কিন্তু খুবই আশ্চর্য এখনো বুঝতে পারেনি" "তাই সে কেমন ক
বলে, এমনই বারবার ক্রমে তার ঠক করে সেই কথাটা বললে — সর্বনাশ পরা
বিধবা বউটা যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল যেমন।"

ঠিকই এ ধরনের বা এর চাইতেও গোলমেলে বাক্যের সামনে পড়লে আমরা
বিভ্রান্ত হয়ে যাই। ..... আঙ্গিক শুদ্ধ গদ্যে কি আরো কিছু বলা যায় যা গদ্যের
অথচ যা ছিলো হাল বাস্তবের তুচ্ছ ঘটনা বা কিছু অনর্থক অনুপুঙ্খ তা
কমলকুমার মজুমদারের ভাষা চোখের সামনেই রহস্যময় গভীর কোনো বি
কবিতা করে তোলেনা, যা চিরকালের সামগ্রী?'

'এ রকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনে
কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন বাংলা গদ্য ভঙ্গী ইংরেজী Syntax অনুযা
ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত কমলকুমার ফরাসী Syntax বাংলায় চালু করেছেন।
পুরোপুরি সত্য নয়। ফরাসীতে বিশেষণগুলি কর্তার পরে বসে, লালমুখো
মুখলাল যে রকম, তাছাড়া ফরাসী ধাতুরূপ ইংরেজীর চেয়ে বেশি কিন্তু স
মতন। এর চেয়েও বড় কথা যতদূর জেনেছি ফরাসী গদ্য ফরাসীদের মুখের
অনুসারী। পৃথিবীতে সব ভাষাতেই গদ্য ও মৌখিক ভাষা কাছাকাছি এগিয়ে
কৃত্রিম অলংকার বহুল ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তার বাহক না হয় বাধা হয়। কিন্তু কমল
মুখের ভাষার সংগে তাঁর লিখিত বাক্যের হাজার যোজন ব্যবধান ..... অ
লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বারবার না পড়লে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষ
বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা অনেকটা কবিতার মত বারবার পড়তে ইচ্ছা হ
শব্দের প্রতি মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই যাদু।"

কমলকুমারের গদ্যকে ঠিক একইভাবে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখলেও চ
চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা' গদ্যের চিত্র' প্রবন্ধে এই গদ্যকে কাব্যধর্মী বলতে
রাজী হননি এবং তাঁর মতে কমলকুমার তাঁর গদ্যকে ভিন্নধর্মী করে তুলতে
কাব্যধর্মী করে তুলতে চাননি। কমলকুমারের রচনা থেকে উদাহরণ নি
দেখিয়েছেন ," দাওয়ার বাঁশের সংগে নৌকার কাছি বাঁধতে বাঁধতে তার অ
দৃশ্য মনে হলো শরতের সকাল। তখন হাওয়া বইছিল,ছোট একটা কুঁ
দাওয়ায় বসে নিবিষ্ট মনে মৌলভী কোরান শরীফ পাঠ করছিল, মৌলভী
রহমান কালে। সে চেহারা বিশ্রী কিন্তু কেননা যখন সে পাঠ করে ভারী সু
অমায়িক, উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে কোদালটা রেখে ফজল শুনছিল, সে

[illegible] লাগছিল, শুধু তার তখন মনে হয়েছিল, জগদীশ্বর এক কেননা তিনি সবার [illegible] রাখেন। এবং প্রকার কথা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল সত্যি। সে মাথাটা [illegible] চইলো নৌকার প্রতি, খড় প্রায় বোঝাই — একটা ধামা; লন্ঠন... প্রতিটি [illegible] তখন পরস্পর অন্ধকারে ঠাহর করতে পেরেওছিল। তারপর সে নৌকার মধ্যে [illegible] তুলে দাওয়ায় রাখলে — লন্ঠনটা জ্বালানো। ঘরের দাওয়াটা এবার প্রচুর [illegible] মনে হয়েছিল"। এই গদ্যভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চঞ্চলকুমার বলেছেন, "[illegible]মারের এ প্রকার গদ্যভঙ্গী কাব্যধর্মী নয়। চিত্রময় করে তুলবার জন্য তিনি [illegible] খোয়াননি। অনেক খ্যাতনামা লেখক কাব্যধর্মী গদ্য লেখেন এবং তা [illegible] বিস্বাদ লাগে। অনেকের পদ্য আবার গদ্য ধর্মী, তাও আমি গ্রহণ করতে [illegible] এবং পদ্যের পার্থক্য কি, কি তাদের ধর্ম এবিষয়ে প্রশ্ন তুললে আমি বলতে [illegible] গদ্য বা পদ্য,চেনবার কথা বলবার বা চিনিয়ে দেওয়ার কথা নয়। কাজেই [illegible]ই দেখবেন যে কমলকুমারের গল্পটি চিত্র হওয়া সত্ত্বেও গদ্য, পদ্যধর্মী নয়। [illegible] চিত্র কথাটির কি তাৎপর্যগত অর্থ তাও আমি জানিনা,তবে এইটুকু জানি যে [illegible] চিত্র এবং গদ্য বা পদ্যের চিত্র একাকার করে দেখবার নয়"। এই একই প্রবন্ধে [illegible] বলেছেন, "অপর পক্ষে তিনি ভাষাকে বদলেছেন,বাক্যরচনা রীতির বহু [illegible] ঘটিয়েছেন, এক কথায় তিনি একটি প্রায় স্বতন্ত্রভাষাই তৈরি করেছেন, তবু [illegible] মন,ভাব রস আবেগ তথা চিত্র বিকৃত হয়নি। যারা রূপান্তরের অর্থ বোঝেন [illegible] কি দায়িত্ব ভাবেন তাদেরই কাছে চিত্রযোজন ও চিত্র রচনার পার্থক্য ধরা [illegible]।"

[illegible] নরেশ গুহ তাঁর কমলকুমার মজুমদার প্রবন্ধে কমলকুমারের গদ্যরীতির ভেতর [illegible] একধরণের কবিত্বেরই সন্ধান পেয়েছেন। কমলকুমারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি [illegible] তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি এই গদ্যের মধ্যে কাব্যধর্মীতা উপলব্ধি করছেন। [illegible] লোকছিল, একটা প্রমাণ লোক, একটা ছোকরা। লোকটির মাথায় আধমনি ধামা [illegible] ধামা ছিল। কাঁধের গামছায় দুমুখে দুটো পুটুলি পিছনের ছেলেটার কাঁধে নতুন [illegible] ঘড়া মাথায় পুটুলি — গায় র্যাপার। লোকটির গায়েও চাদর বুট পর্যন্ত— [illegible] মোটা পৈতে।

[illegible] পা দিয়ে পথ চলার শব্দ হচ্ছিল মুস-মুস। এরই উপর বললে — তোর মামির [illegible]—। তোমার খুব খাতির করিল মামা না, — সে তার প্রতি বলেছিল, মামা [illegible] উত্তর দিলে না। মন্দি মন্দি এমন ছেরাদ্দ হয় তবে গে না, — সে তার প্রতি [illegible]। হু — খুশি হয়েই সে তখন ছেলেটির প্রতি বলেছিল নে পা চালা দেকি।'

এই উদ্ধৃতি দিয়ে নরেশ গুহ বলছেন, " কমলকুমার আমার কাছে অন্তত, এক
অপরিমাণ, শক্তিশালী শিল্পী যাঁর রচনার প্রধান গুণ বিষয় নির্বাচনে নয় বিষয় অবল
গড়ে তোলা রচনার কারিগরীতে। সেই কারিগরী না থাকলে অভিসন্ধি ব্যর্থ
মানুষের দুঃখ নামক একটা নিরাকার ভার কান্নাচাপা পরিহাসের ভিতর দিয়ে বে
এসে আমাদের বুকের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং চলাফেরা করতে পারতো
সমাজবদ্ধ প্রতিকারযোগ্য দুর্দশার চাইতে গভীরতর কোনো নিঃসঙ্গ হাহাক
প্রতিমূর্তি তিনি খোদাই করতে পারতেন না তাঁর গল্প কাহিনীতে। ক্রমাগত
শুকিয়ে যায় শব্দের সলতে থেকে। কমলকুমার তাঁর নিজস্ব নিপুণতায় উস্কে দি
সেই সলতে মূলতঃ কবি না হলে কখনোই পারা যায় না।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কবি এবং সাহিত্যিক শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী আবার কমলকুমারের ক
সাহিত্যকে চিত্রশিল্পের সংঙ্গে তুলনা করেছেন। কমলকুমারের সাহিত্যের মধ্যে
দেখেছেন এক শিল্পীর উপস্থিতি। আবার কোথাও কোথাও মনে হয়েছে সে
ভাস্কর্য। কমলকুমার যেহেতু শিল্পী ও ভাস্কর দুই-ই ছিলেন, সহজাতভাবেই
রচনায় একটা শৈল্পীকি বোধ আসতেই পারে। পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর লেখা নিয়ে বল
একজন অনুভূতিশীল পাঠক যার আদৌ জানা নেই কমলকুমারের শিল্পী পরিচয়
কখনো পাঠ করেননি তাঁর শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা তিনি কিন্তু তাঁর ছোটগ
উপন্যাস পড়েই অনুমান করে নিতে পারবেন যে এই লেখকের এক চোখে জীব
অভিজ্ঞতার জ্যোতি অথবা এমনও মনে হতে পারে কমলকুমার জীবনকে দেখে
এবং দেখতে চেয়েছেন একজন শিল্পীর চোখ দিয়ে। তাঁর ছোটগল্পগুলোকে মনে
পারে ড্যুরার অথবা রেমব্র্যান্টের মহত্তম এচিং এর মত কাজ আর উপন্যাসগুলে
মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সিস্টাইন চ্যাপেলের সিলিং এর ফ্রেসকো। তাঁর উপ
প্রসঙ্গে অন্য কোনো স্মরণীয় পেন্টিং এর পরিবর্তে এই বিশেষ ফ্রেসকোর কথা
এসে যায় সম্ভবত এই কারণে যে পেন্টিং থাকে আমাদের চোখের লেভেলে।

কমলকুমারের রচনা পড়ার সময় তার দেওয়া বর্ণনাকে অনুসরণ করেতে
অনেকটা যেন এইভাবেই থেকে থেকে উর্ধ্বমুখ হতে হয় আমাদের। তাঁর উপ
এমনকি ছোটগল্পেরও অনেক মুহূর্ত দণ্ডপল যতখানি ছুঁয়ে থাকে আমাদের
পৃথিবীর ভূস্তর ঠিক ততখানিই ছুঁয়ে থাকে অচেনা অন্তরীক্ষ। তাঁর 'অর্ন্তজলী
এবং 'গোলাপ সুন্দরী' প্রথম পাতাতেই মিলবে এর প্রমাণ। কিংবা এমনও মনে
পারে যে তাঁর ছোটগল্পগুলো পেন্টিং আর উপন্যাসগুলো ভাস্কর্য।

অনুকরণে আমরাও বলতে পারি কমলকুমার মজুমদারকে যদি একটা চিত্র সাথে তুলনা করা যায় তাহলে উত্তরদিকের দেওয়ালে দেখতে পাবো স্কেচ আর দিকের দেওয়ালে ওয়াটার কালার, পূর্বদিকের দেওয়ালে পেন্টিং আর পশ্চিমে সিলিংএ ফ্রেসকো মেঝেয় কারুশিল্প।

তার রচনাকে এছাড়া অন্য কোনোভাবে বিশ্লেষণ করা সত্যি খুব কঠিন। কারণ শিল্পের সমস্ত কিছুই যেন সমবেত আর সত্যিই প্রতিমুহূর্তে সেখানেই হিরে জহরতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে শিল্পের প্রসঙ্গ, এমনকি শিল্পের মাধ্যম, যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্য পেন্টিং টেরাকোটা, ক্যালিগ্র্যাফি, কাঠখোদাই, পুতুলশিল্পও। আর সেই দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি জীবনকে তিনি করেছিলেন কি বোধের পটভূমিকায়।

খানে রং লেগে থাকে দৃশ্যের অভ্যন্তরে। সেই রং মানুষের চলা হাঁটার ঘূরপাকের ধাক্কায় ভেঙে টুকরোও হয়। কখনো কখনো আবার সেই ভাঙা এক বহু বর্ণময় প্রতিফলনে মানুষ বা প্রাণীর অবয়বে ঘটতে থাকে রং বদলের আবার কখনো কখনো রং নয়, কিংবা মাত্র দুটি রং যথা আলো আর অন্ধকার, আর কালো বেছে নেন তিনি, আর চরিত্রকে বসিয়ে দেন তার মাঝখানে, আর দাঁড়িয়ে অবলোকন করেন চরিত্রদের বহিরঙ্গের অদল বদল যা তার পক্ষেও চরিত্রদের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচনের পক্ষে একান্ত জরুরী। কি অসম্ভব তিনি রংয়ের সাহায্য কখনো চরিত্র, কখনো মুহূর্ত, কখনো অন্তর্লোক এই শিল্পকাজটা করে যান।

যত এগোচ্ছিলেন ততই অবশ্য তাঁর রচনা থেকে খসে পড়ছিল রঙ। রঙ পর্বের রচনার মতো ব্যাপকতা এবং উজ্জ্বলতা থাকে না আর। শেষ তাঁর অন্বেষণ যেন চিত্রকলার বর্ণ সমাবেশ নয়, ভাস্কর্যের অবয়ব। তাই রচনায় সেখানে তিনি অনায়াসে লিখতে পারতেন 'এক অনির্বচনীয় আহ্লাদ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।' এখন সেখানে 'রক্তিম' কেটে বসিয়ে দেন গোঁয়ার। লেখেছেন 'সঙ্গীহীন নীল শূন্যতা' এখন সে নয়নে হয়ে যায় গূঢ়তম বুক

শেষ পর্বের রচনায় আমাদের চোখে পড়ে অনেকটা এই রকম ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্ট আইডেনটিটি মুছে দিয়ে তার শরীরে অন্য নতুন তাৎপর্য জুড়ে লোরকার মতো এখানেও যেন সক্রিয় এক ধরনের চোরা ভায়োলেন্স,

এক ধরনের ছাইচাপা আগ্নেয় বিক্ষোভ, সময় ও সমাজের অমানবিক অ
অপদার্থতার দিকে তাকিয়ে। বিশেষ করে তাঁর 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসের
তাকালে শক্ত শিরদাঁড়া পেয়ে যায় আমাদের ধারণা। কেননা সেখানে রয়েছে
একাধিক এমন স্বীকারোক্তি যা বেদনায় নীল, এবং মানুষের উদ্ধারহীন
নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্যের অসহনীয়তার বিস্ফোরণলাল"।

কমলকুমারের অন্য আর এক সমালোচক শ্রী হীরন মিত্রও কমলকুমারের রচনার
চিত্রধর্মিতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলছেন, 'আঁকা আর লেখার মধ্যে কিছুটা
আনন্দও থাকত যেমন ওনার লেখার মধ্যে প্রায়ই গল্পে বা উপন্যাসে ফুটে উঠত
পিকেচারিয়াল এফেক্ট-ই নয়, চিত্র রচনার জন্য মনন দাবী করে এক অনুভবি
সামগ্রীক অর্থে শিল্পী বানিয়ে তোলে, কারণ শিল্পী যেমন চিত্ররচনা করেন,
শিল্পীকে রচনা করে। সেই লক্ষণ, সেই ধারাবাহিকতা, কমলকুমারের চি
বারবার দেখতে পাচ্ছি। একটা নিজস্ব ভাবের জগৎ, অভিব্যক্তির ঘরনার
বিস্ফারিত চোখে, যেন পট থেকে উঠে আসা মূর্তিগুলির পারস্পরিক
পোড়ামাটির মন্দিরের কাজের আদলে, জীবন নিয়ে ভরপুর, চলেছে শান্তি
দৃশ্যের মিছিলে, নৃত্যে, ছন্দে, আবেগ তার বড় আপন।"

"আকারে যত ছোটই হোক বড় মায়া আছে। ওনার গদ্য বিহারে যেমনই চলন
ভাবনায় ভাষায়, ঘটনার ঘুলঘুলাইয়ার যতই উনি নিজেকে বিস্তারিত করে দি
আপাত জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হলেও পড়তে পড়তে একটা ঘোর লাগে।
মননের দাবীদার গভীর রাত্রে অথবা ভোরের শিশির গন্ধে যখন ওনার গদ্য প
ভাবনা পড়ি, অদ্ভুত চেতনার দ্বারে নিজেকে নিমগ্ন থেকে নিমগ্নে সেঁধিয়ে
হারাবার যেন ভয় নেই, কোথাও একটা মাধুর্য আছে।'

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী তাঁর কমলকুমার সংক্রান্ত আলোচনার কমলকুমারের গল্প
(structure) তা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, "কমলবাবুর ভাষার দিকে
দিলে, আমার যা মনে হয়েছে, নির্বাচনে এবং গ্রন্থনা এই দুটি কোটিতেই
সাক্ষ্য নজরে পড়বে, তবে অন্বয়ের অঙ্ক বরাবরই যেন শৃঙ্খলাকে অতিক্র
প্রবণতাটা মনে হয় বেশি। ভাষাগত অপসৃতির তত্ত্বের সঙ্গে কতদূর খাপ
একটি জরুরি প্রশ্ন। তাছাড়া আরও যা বড় কথা, ঐ জাতীয় তত্ত্বের মধ্যে একটি
দুর্বলতা থেকেই যায়ঃ তা হলে, তার প্রকরণবাদী বদ্ধতা। ইতিহাসকে তত্ত্ব
বাইরে রেখে, ভাষা বা পাঠ্যের সংগঠক অভ্যন্তরীণ মাত্রাগুলির সহায়তায়। ই
পাঠ্যের মধ্যে ফলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। অনচ্ছতার দুর্লঙ্ঘ্য আড়াল।

উদ্যোগে, হালের ভাষা ব্যবহারের দিকে, পিঠ ফিরিয়ে, কমলবাবু তাঁর ভাষা কে গড়ে তোলেন। কেন তাঁকে তা করতে হয়? এই তাগিদটি অনুভূত হল কেন ? তাঁর উত্থানভূমিটি কি হালের ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে গভীর কোন ভাষাদর্শগত ? ভাষাকে নতুন আদল দিয়ে, অনেকটা তারই সহায়তায় কি লুপ্ত বিকল্প তিক স্মৃতির পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি? তা' যদি হয়, প্রতিবাদটি কার ? কেনই বা? অন্যমনস্কতার ফাঁকফোকর দিয়ে হলেও, ভাষা ব্যবহারে এসে বাধ্য সাংস্কৃতিক অভ্যাসের জের। যেমন বলা হল, প্রক্রিয়াটি কিন্তু বহুলাংশে চৈতন্যের অগোচরে থেকে যায়। তুলনীয় একটি অর্থে, গঠনবাদীদের ভাষায়, কথা বলে না, তাকে বলায় গঠনবাদী তাত্ত্বিক ঝোঁকটি— নাকচ করেও এ সত্যটি আমাদের নিতেই হয় যে ভাষা ব্যবহারে, তার রীতি ও আদলের পিছনে, চৈতন্যের অনেক তল দিয়ে কাজ করে চলে এক দীর্ঘ ও জটিল সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অভিজ্ঞতার বহুতল টানা পোড়েন সহ। অন্যদিকে সাহিত্যকর্ম কিন্তু সচেতন উদ্যোগ। সজাগ ব্যক্তি প্রেক্ষিতটির ভূমিকা এখানে তাই প্রবলতর। কমলবাবুর , ভাষা ব্যবহারে যতদূর পর্যন্ত তিনি স্ব-তন্ত্র এবং বে-নজির, এই অভ্যাস এবং তার কার্যকর যে বিশ্বাস এবং আদর্শকে যতদূর পর্যন্ত নিজহাতে একা তিনি গড়ে ন, ব্যক্তিউদ্যোগটি যে বিশেষ গুরুত্ব পায়, দাবি রাখে আমাদের মনোযোগী উপর, যে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ মনে হয় না আছে।"

এবং অধ্যাপিকা নবনীতা দেব সেন কমলকুমারের অনন্যতা মেনে নিয়েও তাঁর তা এবং দেশ-কাল-পাত্রের প্রেক্ষিতে তাঁর প্রতিভা অপচয়িত হয়েছে বলে মনে । তিনি বলছেন 'কমল কুমার মজুমদারকে আমরা ভারতীয় ঔপনিবেশিকতার একজন অতি উৎকৃষ্ট শিল্প বিম্বিত উদাহরণ স্বরূপ পুরাণপুরুষ বলে মনে করা

পরিবর্তনশীল সমাজ, যা ঐতিহ্য থেকে সরে আসছে অভিনবত্বের দিকে, গ্রাম শহরের দিকে, ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের দিকে, অন্ধ সংস্কার থেকে তীব্র বিতর্কের যাত্রা চলেছে, সেই সমাজের পক্ষেই কমলকুমার মজুমদারের মতো এমন এক অবরোধে বিক্ষত, বহুধাবিভক্ত মনের শিল্পীকে জন্ম দেওয়া সম্ভব। তিনি ব্রিটিশ কিতা প্রসূত বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে, মাতৃভাষাকে বিমুক্ত বাংলা ভাষাতে। ফলে তিনি ঝেড়ে ফেলেন চলতি বাংলার স্বাভাবিক রূপ, করেন এক আলাদা বাংলা ভাষা প্রকরণ যা তাঁর মতে দুশো বছরের বিজাতীয় সংস্কার মুক্ত।"

"কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে কয়েক বছর আগের 'চতুরঙ্গে' আমার প্রবন্ধে আমি
দেখিয়েছি যে সে ভাষাটি প্রাক ব্রিটিশ যুগের বাংলা নয়। কোন যুগেরই নয়।
একান্তভাবে কমলকুমারের স্বকীয়। লেখকের মধ্যে কতগুলো আশ্চর্য দ্বন্দ্ব বিরাজমান
ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার পরিণতি হিসেবে যে দ্বন্দ্বগুলি সহজেই বোধগম্য ও বৈধ
তিনি নিজেকে ঐতিহ্যবাদী হিন্দু বলে চিনতে এবং চেনাতে চান। হিন্দু স্বস্তি বচন দি
লেখা আরম্ভ করেন। অথচ ব্যাকরণকে চূর্ণ চূর্ণ করে ফেলে চিরন্তন ঐতিহ্য এ
সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁর ভাবনার মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে। কখন
তা অত্যন্ত মানবিক, জনদরদে পরিপূর্ণ, উদার, সংবেদনশীল, দরিদ্রের ওপর ধনী
সামাজিক অত্যাচার, শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সম্মুখগামী ভাবনা। আব
কখনও তা শ্রেণীবিভাগে, বর্ণবিভেদে বিশ্বাসী, বংশমর্যাদায় বিশ্বাসী, অতিহি
কুসংস্কার আচ্ছন্ন, সমকাল বিরোধী, আধুনিকতা বিরোধী, ধর্মপরায়ণ আচ
পশ্চাদমুখী ভাবনা।

এই দু'রকমের ভাবনার সঙ্গেই, তাঁর রচনাশৈলীর বিপুল এক অন্তর্বিরোধ রয়েছে।
উক্ত দু'ধরণের ভাবনারই মূলত দ্বি-মুখী আবেদন আছে।

রাজনীতিও দরিদ্র-শোষণ বিরোধী, আলোকিত মনের কাছে একটি ধরন পৌঁছ
অন্যটি পৌঁছবে নিরালোক, প্রাচীনপন্থী অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন হিঁদুয়ানার কাছে। এর ফ
প্রায় সমাজের দুই প্রান্তেই পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর বিষয়গত আবেদন।

আমি সবিনয়ে এইটুকুই বলব যে,এই অন্তর্বিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইতিহাস সি
কলকাতা শহরের যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসিক পটভূমিতে শিল্পীপুষ্ট হয়েছেন -
দুইজগতের সদাবন্ধন বিরুদ্ধতার টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের তন্তুজাল বে
হয়েছে,তাতে এই অন্তর্বিরোধএতটুকুও বোধের অতীত নয়। অনৈতিহাসিক ন
কমলকুমারের অসামান্য শিল্প-চেতনা, তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতাই তাঁর মধ্যে তীব্র
করে তুলেছিল ঔপনিবেশকতার বিষক্রিয়াকে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
শিল্পের ভারসাম্য। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা একান্ত আধুনিক এবং একান্ত ভার
একটি মহাশিল্প প্রতিভা তীব্রভাবে ঔপনিবেশিক অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়লে
কতটা ভারসাম্য হারাতে পারে, নিঃসন্দেহে তার এক চরম নিদর্শন মেলে কমলকুমা
মধ্যে।

শ্রী অশোক মিত্র তাঁর শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় কনুদা, তাঁর এই ব্যতিক্রমী, ভিন্নধর্মী, গদ্যচ
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'কনুদা, কমলকুমার মজুমদার, যে গদ্যশৈলীতে উ
করেছিলেন, তা কি স্বাভাবিক উত্তরণ না কি বন্ধু সহচর বয়স্যদের সঙ্গে এঁড়ে ত

[illegible] কনুদা যখন যা বলতেন, গভীর আপাত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন, রঙ্গ করে [illegible] না তন্নিষ্ঠার সঙ্গে বলছেন চট্ করে বোঝা প্রায় অসম্ভব ছিল। 'ফজল হয় একটি [illegible] লোক কারণ সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে', উনবিংশ শতকীয় পাদ্রিদের ঐ ধরণের [illegible] দের প্রবর্তন কানুদা দাবী করতেন, তাঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষণহেতু নয়; তিনি [illegible] একটা সময়ে দখনে অঞ্চলে চষে বেড়িয়েছিলেন। ঐ অঞ্চলের চাষীরা নাকি [illegible] হুবহু ঐ ধরণের বিন্যাস ব্যবহার করেন, পাদ্রি সাহেবেরা তাঁদের কাছ থেকে [illegible] গদ্যই অনুশীলনের বইতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রতিপাদ্য কমলকুমার [illegible] কাছে। আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত একটি মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার হয়ে শব্দের [illegible] যে নিখাদ বাংলা গদ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে থেকে আহৃত বাংলা আসলে [illegible] এই প্রমাণ করার জন্য কনুদা উঠে পড়ে লাগল। সব মিলিয়ে যদি পুরানো [illegible] বুলি ব্যবহার করি, তিনি যে শৈলীতে স্থিত হলেন তা ধোঁকার টাটিও [illegible] কিন্তু কোন ঐতিহ্য রচিত হল না, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সেই শৈলীরও দেহান্ত। [illegible] ভাষাকে স্বভাবজ হতেই হবে; সেই স্বাভাবিকতা কমলকুমার মজুমদারের [illegible] তাই তা কোন ধারবাহিকতার জন্ম দিতে অসফল হলো।

[illegible] একজন সেই মানুষ, যিনি মাটির কাছাকাছি থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে [illegible] এক নিরীক্ষামূলক বাক্যবিন্যাস ও ছেদ-যতি চিহ্নের ব্যবহারের মধ্যে [illegible] কে কেন্দ্র করে অজস্র জিজ্ঞাসা বিতর্কের সৃষ্টি হলেও, বাংলা কথা সাহিত্যে [illegible] তা নিঃসন্দেহে একটি নতুন ধারা নিয়ে এল। সেই ধারা খুব যে বেশি [illegible] তা হয়তো নয়। তাঁর কারণটা হতে পারে কারো কাছে কমলকুমারের [illegible] কারও কাছে হয়তো ততোখানি গ্রহণযোগ্যতার অভাব। সেই গ্রহণযোগ্যতার [illegible] বিন্যাসের কারণজনিত হতে পারে, হতে পারে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের [illegible] কিন্তু কমলকুমারই সেই মানুষ, যাঁর লেখা পড়ে মনে হয় তিনি একই সঙ্গে [illegible] কে কাছে টানতে পারেন বা দূরে রাখতে পারেন। তাঁর রচনা পড়ে কোন [illegible] আসুক বা না আসুক, তিনি মানুষের কৌতূহলকে কিন্তু সদাজাগ্রত [illegible] তাঁর রচনা পড়ে কারও মনে হয়েছে কাব্যিক, কারোও মনে হয়েছে তা' [illegible] জীবন্ত ভাবে গদ্য। কারও মনে হয়েছে তিনি এমন একটা সময়ে [illegible] যখন ঔপনিবেশিকতার ভাব-জট তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। [illegible] রীতিও যে বাংলা সাহিত্যে তেমনভাবে অনুসৃত হয়েছে তা' নয়। তবু [illegible] বাংলা গদ্যের চর্চায় কমলকুমার একটি অপরিহার্য নাম। তাঁর [illegible] এখনও অনেক প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা থমকে আছে, বিষয়ে ও টেকনিক [illegible] গুলো নিয়ে নিশ্চয় গবেষণা হবে, আলোচনা হবে, বিতর্ক হবে এবং তারই

ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসবে অনেক তত্ত্ব, অনেক তথ্য যার মধ্য দিয়ে
দেখতে পাবো, এক এখনও অনাবিষ্কৃত এক কমলকুমারকে, আর শুধু তাঁকেই
থেকে হয়তো বাংলা গদ্যে আরও এক নতুনধারা জন্ম নেবে, যেটা হয়তো
কমলকুমারের ধারাও নয়, আবার তার মধ্যে কমলকুমার কোন ভাবে হয়তো উ
থাকবেন, থেকে জন্ম দেবেন নতুন আরও কোনও ধারার, নতুন সাহিত্যিকে
এইভাবেই সময়ান্তরে কমলকুমাররা উপস্থিত থাকেন তাঁর নিজের সময় ছাড়িয়ে

সূত্র ঃ

১) কমল কুমার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের খোঁজ ঃ শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২) গল্প সমগ্র ঃ কমল মজুমদার -।

৩) উপন্যাস সমগ্র - কমলকুমার মজুমদার ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

৪) কমলকুমার ও কলকাতার কিস্‌সা ঃ অনিরুদ্ধ লাহিড়ী।

TABLE 2

ছোটগল্পকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ডঃ উত্তম পুরকাইত

আংশিক সময়ের অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

[illegible] উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত লেখকের স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন বিরল প্রতিভাধর [illegible] একজন। হেমিংওয়ের ক'টি উপন্যাসের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় [illegible] উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও দুটিকে তো নভেলেট বা উপন্যাসিকাই [illegible] সেক্ষেত্রে শুধু *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ [illegible] ঔপন্যাসিকদের একজন। যদিও মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে চলে যেতে না হলে [illegible] আরো কিছু অত্যাশ্চর্য উপন্যাস ছোটগল্প লিখতেন — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু [illegible] উপন্যাস একজন প্রতিভার মূল্যায়নের মাপকাঠি হতে পারে। উপন্যাস আয়তনে [illegible] বা বড়ো তার ক্যানভাস সর্বদা বৃহৎ। আখ্যান, চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি [illegible] স্বাধীনতা অনেক বেশি। বিশেষত আধুনিককালের উপন্যাসে, যে [illegible] সঙ্গে অদ্বৈতের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। মৃত্যুর পর সংগৃহীত গ্রন্থের যে সম্ভার [illegible] লাইব্রেরীর হাতে অদ্বৈতের সুহৃদ বন্ধুরা তুলে দিয়েছেন তা দেখে সহজেই [illegible] করা যায় আধুনিক কথাসাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাঙা-গড়ার সাথে তিনি [illegible] ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাছাড়া যে দু-তিনটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাতেও দেখা [illegible] অনুজ হয়েও অগ্রজ কোনো নবীন কবিকে শিল্প সাধনার পরামর্শ দিতে নিতান্ত অল্প [illegible] সাহিত্যের রূপকল্প বিষয়ে তাঁর ধারণা কত স্পষ্ট। স্বভাবত এই তরুণ লেখক তাঁর [illegible] বয়সে লেখা তিতাসের মত বৃহৎ উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে [illegible] এটাই স্বাভাবিক। উপন্যাসের একটি বড়ো শর্তই তো সমগ্রতা। অবশ্য শুধু [illegible] কেন, যাঁরা তাঁর আগে-পরে অনেক অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁরা [illegible] জানেন সমগ্রতার নিরিখে তাঁরা হয়তো একটা উপন্যাসই লিখেছেন ভিন্ন ভিন্ন [illegible] প্রতিটি উপন্যাসই হবে মৌলিক, পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জগৎ খুলে [illegible] প্রতিটিকেই মনে হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ; পাঠক অজন্তা ইলোরার পর তাজমহল [illegible] কোনারকের সূর্যমন্দির আবিষ্কারের মত আনন্দ পাবেন — এমন প্রতিভা বিরলতম। [illegible] একটি উপন্যাসই যদি মহাকালের পাঠকের দরবারে অত্যাশ্চর্য শিল্পকৃতি রূপে [illegible] হয় তবে সেই প্রতিভাকেও বিরলদের মধ্যে একজন মনে করতে হবে। অদ্বৈত [illegible] শুধু বাঙালিদের কাছে নয়, বিশ্বের দরবারেও এক বিক্রান্ত প্রতিভা। তাঁর [illegible] সমস্তটা জুড়েই তিতাস। তবু প্রশ্ন ওঠে ঐ উপন্যাসটিই কি সব! অন্য [illegible] গুলিতে অদ্বৈতের প্রতিভার বিচ্ছুরণ কি নেই?

সমস্যা হল একটি উপন্যাসের দ্বারা একজন প্রতিভার মূল্যায়ন সম্ভব হলেও দু
তিনটে, চারটে প্রকাশিত ছোটগল্প দিয়ে প্রতিভার মূল্যায়ন কতটা সম্ভব! ছোটগল্প
ধূমকেতুর মতো, মহূর্তে রঙ ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটা দুটো ধূমকেতু
প্রতিদিনই আকাশে ঝরে পড়ে, নজরে পড়ে কারো! অনেকগুলি ধূমকেতু একস
পুচ্ছ ঝুলিয়ে তাকে দর্শনযোগ্য করে তোলে। তাই গল্পকারকে অনেকগুলি ছোট
উপহার দিতেই হবে। নইলে গল্পকার পাঠকের নজরে পড়বেন না। প্রতিভার মূল্য
তো আরো পরের কথা। যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন মাত্র বারোটি, মৌলিক
বিচারে আটটি কি ন'টি তিনিই ছোটগল্প লিখেছেন একশ উনিশ বা তেইশ কিংবা অ
দু-চারটে বেশি। একটা, দুটো, বা তিনটে গল্পে গল্পের বিচারই সম্ভব, তার
গল্পকারের মূল্যায়ন সাধারণভাবে সমর্থন যোগ্য নয়। আবার এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানু
অদ্বৈতের প্রকাশিত চারটি গল্পই লেখা হয়েছে তিতাস লেখার পূর্বে। সমস্ত আলোচ
এগুলিকে তিতাস লেখার প্রস্তুতি হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। আর লেখকদের ম
তো একটি ধারণা সংস্কারের মত গেঁথে আছে যে, অনেকগুলি ছোটগল্প লিখে হ
পাকালে তবেই নাকি উপন্যাস রচনায় হাত দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রো
সমস্ত কথাকারই নাকি তাই করেছেন। সুতরাং এই প্রবন্ধে প্রবেশের পূর্বে একটি ধাঁ
মধ্যে পড়ে যেতে হয় প্রবন্ধের শিরোনামেই। কী লেখা যাবে! অদ্বৈত মল্লবর্ম
ছোটগল্প নাকি ছোটগল্পকার অদ্বৈত মল্লবর্মন। সাধারণ যুক্তিতে, প্রথমটিকেই স
বলে মনে হবে, তাতে বিতর্কের অবকাশ নেই, একটি অত্যাশ্চর্য শিল্প *তিতাস এ*
নদীর নাম' লেখার আগে কয়েকটি ছোটগল্প লেখা না হলে হয় না।

কিন্তু বর্তমান পাঠক গল্পগুলি পড়তে গিয়ে পড়েছেন বিপাকে। পাঠকের স্বাধীন
কথা মনে রেখে গল্পগুলি পড়েছি আগে। তথ্যানুসন্ধানে গেছি পরে। তিতাস যে কে
পাঠকের মতই পড়া ছিল। অদ্বৈতের সেই পরিচয়কে সরিয়ে রাখতে চাইলেও বাস্ত
তা অসম্ভব। তবু প্রতিটি গল্পেই গল্পকার অদ্বৈতের মৌলিকতা, প্রতিভার বিচ্ছু
এতটাই চমকিত করে যে পরে জানা তথ্যানুসারে সমালোচকদের সিদ্ধান্ত-এ
তিতাস রচনার প্রস্তুতি, মানতে ইচ্ছে করে না। আমার এই মৌলিকতার ধারণায় অ
কিছুটা রসদ যুগিয়েছে বরং গল্পগুলির সমসাময়িককালে রচিত অদ্বৈতের সংবাদ প
প্রকাশিত প্রবন্ধধর্মী বিশেষ রচনাগুলি। ঐ আপাত বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি একত্রে সংক
হয়েছে অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত অদ্বৈত *রচনা সমগ্রে*। অদ্বৈতের মতামত
চিন্তাসূত্রের কিছু হদিশ পেয়েছি শান্তনু কায়সারের *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন সাহিত্য* এই স্বল্প
অনান্য বইটি থেকে। এগুলি থেকে বুঝতে পারি ছোটগল্প হলেও অদ্বৈত কিন্তু
এগুলিকে বৃহত্তর পৃথিবীর দ্বন্দ্ব জটিলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। চা

ও দু[illegible] গল্পই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক। পৃথিবীর এই গোলার্ধে বসে যুদ্ধের [illegible]গল্প [illegible] নগর কলকাতার পটভূমিকায় ছোটগল্পের সংকীর্ণ গ্রন্থিতে রূপবদ্ধ [illegible]কতু [illegible] মত গল্প নয়। আধুনিক সভ্যতার ভিতরের দিকটায় রয়েছে [illegible] একস[illegible] এবং বাইরের দিকটায় রয়েছে যুদ্ধ। অদ্বৈত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ছোট[illegible]। সাম্রাজ্যবাদের দুই দানবিক সন্তান - ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসিবাদ; মূল্য[illegible] আছে এরা এবং অপর পক্ষে বিশ্বের ক্ষুধার্ত নিপীড়িত মানুষ। [illegible]লিক[illegible] তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির প্রতিটি বাঁকই স্পষ্ট। তাঁর [illegible]বা আ[illegible] জীবনের অভিজ্ঞতা মিলেমিশে অদ্বৈতের চিন্তা প্রায় দর্শন ছুঁই ছুঁই। তার [illegible] সেই চিন্তার ফসল।

[illegible] ও ভারতের চিঠি পার্লবাককে একসাথে পড়তে পড়তে যদি বলা যায় [illegible] নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ শুধু একটি ছোটগল্প নয়, একাধিক ছোটগল্প কিংবা [illegible] Earth এর মতো ভারত উপমহাদেশের পটভূমিকায় সুদীর্ঘ একটি উপন্যাসও [illegible]ছিলেন — তাহলে সকলেই সেইসব ছোটগল্প বা উপন্যাসের কপি কোথা [illegible] তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেবেন। প্রকৃতই সেইসব রচনার খসড়া বা কপি কিছুই [illegible]। অদ্বৈতের সব লেখা পাওয়া যায়নি বলে একথা বলছি না। বলছি মাত্র ঐ [illegible] আক্রান্ত হলেন বলেই আর সেই ছোটগল্প উপন্যাসগুলি কপি করার [illegible] পেলেন না এই কারণে। লেখকের দেখা, অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য, প্রভূত [illegible] সাংবাদিকের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিরন্তর বিচরণে [illegible] যখন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা খুঁজে পায় তখন তা লেখা হয়েই গেছে।

[illegible] তিনটি কি চারটি বা আরো দু-একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন এই বিতর্কটা মুখ্য [illegible] যে গল্পগুলি উত্তর কালের পাঠকের হাতে এসে পৌঁছেছে তা থেকে [illegible] নয় অদ্বৈত আরো বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন বা তাঁর হাতে বা [illegible] ছিল। পরিণত ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠার আগে অদ্বৈত পরিণত ছোট [illegible] হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিটি গল্প শুধু গল্পকে পরিচিত করায় না, গল্পকারের [illegible] চিহ্নিত করে।

দুই

[illegible] এই স্বল্পায়ু জীবনে বলা যায় জীবনযুদ্ধে কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, [illegible] কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠা আর এক যুদ্ধের সামিল। কুমিল্লা জেলার [illegible] সাহিত্য প্রতিভা বলতে অদ্বৈত ও তাঁর থেকে দু বছরের অগ্রজ [illegible]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বড়ো বাড়ির ছেলে। বাবা শিক্ষক ও আই
অপূর্ব নন্দী। অনুশীলন সমিতি, দেশভাগ, যুদ্ধ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা
বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে লড়াই
হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকেও। তবু বলতেই হবে অদ্বৈতের জীবন সংগ্রাম ছি
তীব্র। পারিবারিক শিক্ষা বা বড়ো বাড়ির ঐতিহ্য কোনোটাই অদ্বৈতের ছিল ন
নৃত্য পাটিয়সী মেঘনার নাচের খেয়ালে অস্তিত্ব হারানো তিতাস পারের গোকর্ণ
'গাবর' সমাজের (শ্রমজীবী জেলে সম্প্রদায় - গাবরদের পাড়া।) ভদ্রভাবে
সমাজের প্রতিনিধি অদ্বৈত। শান্ত, নিরীহ ও রোগা মানুষটা প্রতিভা নিয়েও সর্ব
থেকেছেন, থমকে যাবে না তো তাঁর শিক্ষা! বর্ণশাসিত সমাজের আঘাত
বহন করতে হয়েছে। বিপ্লবী রাজনীতিতেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ছা
থেকেই অসম্ভব সৎ ও বিশাল হৃদয়ের মানুষ অদ্বৈত। এই পরিচয় দিতে গি
অদ্বৈতের আমৃত্যু সঙ্গী সুবোধ চৌধুরী অদ্বৈতকে 'মেধাবী ও অনুজ' আ
লিখেছেন "১৯২৮-২৯ নাগাদ আমাদের স্কুলে ধর্মঘট হয়। সেই প্রথম ছাত্র
স্কাউট ট্রেনিং শেষ করার পর পদক প্রদান অনুষ্ঠানে কুমিল্লার এস.পি. এসেছে
ছাত্ররা ঠিক করেছে তারা কিছুতেই ইউনিয়ন জ্যাককে অভিনন্দন জানাবে ন
পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘট। স্কুল প্রায় জনমানব শূন্য। সামান্য উত্তেজনা আছে। ফ
ঘরের কোথাও কেউ আছে কিনা দেখতে গিয়ে বড়ো হলঘরের এক কোণায়
পেলাম অদ্বৈতকেও। কাঁদছেন। কারণ তাঁর ধারণা ধর্মঘটে যোগ দিলে তাঁর স্ক
চলে যাবে। তাহলে তো পড়তেই পারবেন না। আর ধর্মঘটে যোগ না দে
মানতে পারেন না।" অভাব, দারিদ্র্য, অস্তিত্ব হারানোর শঙ্কা আবার শিকা
গভীর টান। মালোপাড়ার ছিন্নমূল স্বজনদের হৃদয় দিয়ে আগলে রাখার প্র
প্রচেষ্টা অদ্বৈতকে বহুমুখি লড়ায়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। কোনোভাবে ক
পৌঁছানো গেলেও কলম পেশা জীবিকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার স্থায়িত্বকে
বিঘ্নিত করেছে। স্বাধীনতার লড়াই, যুদ্ধের কালোছায়া, দুর্ভিক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ
সমকালীন কলকাতায় যত প্রকার আশঙ্কার, আতঙ্কের ছাপ ফেলেছিল শিকড়হী
লেখক, সাংবাদিক হিসাবে তার সমস্ত আঁচ তাকে ভোগ করতে হয়েছে।
গল্পগুলির শরীরেও সেইসব অভিজ্ঞতার দাগ। কিন্তু তা সাংবাদিকের প্রতি
নয়। সাহিত্যের প্রকরণগত সিদ্ধিতে কোথাও ফাঁকা নেই। রূপক-এ,
বিবরণে, সংলাপে, বাস্তবতায়, মনস্তত্ত্বের সাবলীল উপস্থাপনায় ছোটগল্পগুলি
আধুনিক।

এক পয়সার একটি গল্প সিরিজে অদ্বৈতের একটি গল্প ছেপেছিলেন। সুবোধ জানিয়েছেন 'গল্পটি তখন বেশ খ্যাতি পায়। আরো কিছু গল্প তিনি ১৯৪০-৪২ এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পটি *স্পর্শদোষ*, সম্ভবত অদ্বৈতের অদ্বৈত ক্যাপটেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় কর্মরত নবশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। তখন জীবিকার টানে নানা ধরনের লেখা অদ্বৈতের প্রথম গল্প ১৩৪৫ শে ভারতবর্ষ পত্রিকার একটি সংখ্যায় গল্পটি সন্তানিকা। *স্পর্শদোষ* সম্পর্কে আরও একটি তথ্য পাওয়া যায়। নামে একটি গল্পসংকলন সম্পাদনা করেছিলেন অদ্বৈত এই সংকলনের শেষ গল্পটি **স্পর্শদোষ**। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশন এ্যান্ড প্রকাশিত সংকলন **ভাসমানে** (১৯৯৬) প্রথম পাওয়া যায় **কান্না** বহুর এত বছর পরে প্রকাশিত হলেও এ গল্পটি তিতাসের সমসাময়িক বা শুরু হওয়া -র কাছাকাছি রচনা । কারণ এই গল্পের প্রধান চরিত্র তিতাস একটি নদীর নামেও দেখা যায়। চরিত্রটি তিতাসের আগেই অদ্বৈত তিতাসের প্রথম কিস্তি ছাপা হয় ১৩৫২ মোহাম্মদীতে। এই সময় মোহাম্মদীতেই কর্মরত ছিলেন। এই ১৩৫২ মোহাম্মদীর একটি সংখ্যাতে অদ্বৈতের আরও একটি গল্প *বন্দী বিহঙ্গ*। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখ স্পষ্ট এটিও ১৯৪৪-এর আগে রচিত। গল্পের পটভূমি বিচার করলে গল্পটি -এর আগেও হতে পারে। *অদ্বৈত রচনা সমগ্রে* - এই চারটি গল্পই মুদ্রিত এবং সম্পাদক যথারীতি লিখেছেন - আর কিছু গল্প অদ্বৈত লিখেছিলেন। সেসব কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

তিন

প্রথম বড়ো পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প হলেও জানা যায়- ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীনই অদ্বৈত গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও ঐ বিদ্যালয়েই ছাত্রাবস্থায় গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। অদ্বৈত যে অনুসরণ করবেন তাতে আশ্চর্য কি! তাছাড়া আঠারো উনিশ বছর বয়সে আন্দোলনে যোগ দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গ্রেপ্তার হওয়া। তাঁর সাহিত্যচর্চার নজরদারি, 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্ম নামে গল্প লিখে চলা - এ সমস্ত অদ্বৈতের অনুপ্রেরণা হতেই পারে। অন্নদা উচ্চবিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তিনিও তো মত কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সুতরাং সন্তানিকা-এর প্রথম গল্প তা নিশ্চিত নয়। একই স্কুল ও একই কলেজের এক-দু ক্লাসের

অগ্রজেরা সাহিত্যচর্চার যে পরিবেশ ও দেশজ আবেগ উত্তেজনার যে বাতাস তৈ
যান প্রতিভাবান অনুজ আরও প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠলেও সেই অনুপ্রের
লিখবেন, অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এত কথা
একটাই কারণ, **সন্তানিকা** গল্পে অদ্বৈত যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন প্রতিভার ক
রেখেও একজন নগন্য গল্পকার হিসাবে বলতে পারি তা একেবারেই প্রথম হাতে
নয়। গল্পটির স্পষ্টতই চারটি অংশ। এক বৃদ্ধ শিক্ষকের স্কুল হারিয়ে ছা
বেড়ানো। দ্বিতীয় অংশে বৃদ্ধ শিক্ষকের ছাত্রটির পরিবারের সঙ্গে নিজেকে
ফেলার চেষ্টা। তৃতীয় পর্বে ছাত্রের ও বৃদ্ধ শিক্ষকের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় যে
লীলা গল্পটিকে জমিয়ে রাখে তাতে গিন্নীমা বা ছাত্রটির মায়ের চোখে বৃদ্ধ শিক্ষ
তাঁর আর একটি সন্তানে পরিণত হন। চতুর্থপর্বে বৃদ্ধ শিক্ষকের স্বপ্নভঙ্গ হলেও
মাতৃত্বের কাছেই শেষ আশ্রয় পেয়ে যান। এই মাতৃত্ব বড়ো হয়ে ওঠাতেই
নামকরণ হয় **সন্তানিকা**। এই গল্পের প্রতিটি চরিত্র শুধু নিজের নিজের বৈশি
মনস্তত্ত্বেও স্বতন্ত্র। আবার শুধু স্বতন্ত্র নয় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ পরিবারের এক
টাইপও বটে।

এক irony তুল্য চমক দিয়ে গল্পের সূচনা। শিক্ষক-ছাত্রের পিছু নি
ডিটেক্‌টিভের মত। নিতান্তই নিরীহ ছাত্র, গোবেচারা ছেলে। এখানে গোয়েন্দ
অবকাশ কোথা। লেখক আরো জানাচ্ছেন। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছেন এ
শিক্ষক। এতদূর থেকে যে, তা'র খালি পায়ে ধূলোর যে আস্তরণ পড়েছে তাকে গ
বলেছেন-'যেন মোজা পরিয়াছে।' ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রাম্য ম
পণ্ডিতমশাইদের দুর্গতির চেহারা যেমন হয় এই বৃদ্ধ মাস্টারের বর্ণনাও তাই
মাস্টারমশাইদের আমরা অদ্বৈতর আগে শরৎ সাহিত্যে নিশ্চয়ই দেখে থাকব। প
বর্ণবিভাজিত হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের ভূষণ, পুজো-আচ্চা ছাড়া উনিশ শ
রেনেসাঁর দৌলতে স্কুল শিক্ষকতা ব্রাহ্মণের আর একটি একছত্র পেশা। তবে প
দেশে সে জীবিকা একান্তই সরকার ও গ্রাম প্রতিবেশী, জমিদার সম্প্রদায়ের
নির্ভর। বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশক থেকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন য
হয়েছে গ্রাম্য ক্ষেত্রে সরকারের দাক্ষিণ্য ততই কমেছে। *পল্লীসমাজ*-এ রমেশ
এসে মাস্টারমশাইদের করুণ দশা দেখেছে। বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে স্কুলকে বাঁচ
চেষ্টা, কত নগন্য দাক্ষিণ্য ও দারিদ্র্য নিয়েও তাঁরা শিক্ষাকতায় অবিচল থেকে
সুতরাং স্কুল উঠে যাওয়ায় বৃদ্ধ ধনঞ্জয় ঘোষাল- "যার আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ
বিষয়-আশয় নেই, সম্বল বলতে গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, বাম বক্ষে একটা শত
কাপড়ের পুঁটুলি। শততালি দেওয়া চটি জোড়াটা সে বাম হাতে রাখিয়াছে। ডান

TABLE 2

ছাতা আর একটি বাঁকা লাঠি।" একটি ছাত্রের জন্য গোয়েন্দাগিরির পথ নিয়েছেন তার একটা উত্তর পাঠককে খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু গল্পকার হঠাৎই এই টাইপ পরিচয় থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে দেন। সেখানেও আর এক irony ভেঙে দেয়। ধনঞ্জয় প্রকৃতই কি পর্যটক! ধনভিক্ষা, ব্রাহ্মণের স্বভাবগত -বিলাসের প্রতি অনুরাগ; দারিদ্রতার কারণে ক্ষুধা কাতরতায় ভোগতৃষ্ণা হয়েছে। তারজন্য পর্যটনবৃত্তি স্বাভাবিক। গল্পকার নাটকীয় বর্ণনার আড়ালে বৃদ্ধের বেদনাকে যেন গোপন রাখতে চান "যেন একজন ঘোর হইতে কেমন করিয়া সে জীবনের এই শেষের পথে আসিয়া পড়িয়াছে সে সে-ই জানে। দুনিয়ায় আর কে কে জানে জানি না।" এখানে অদ্বৈতের স্বভাব যেন ছাপ ফেলে। লোভী ব্রাহ্মণের পেটুকতার পরিচয় ছাপিয়ে বেদনার খোঁজ রাখে কজন।

এই ব্রাহ্মণ শিক্ষকের স্বভাবগত ত্রুটিগুলোকে কোথাও ঢেকে রাখতে অদ্বৈতের শিল্পরীতি অনেকটা বিভূতিভূষণীয় । একটা সহানুভূতি মানবিক রেখেই তিনি বাস্তবতাকে রূপ দিতে চান। আমাদের ভুললে চলবে না এ হয়েছে তখন যখন বিভূতিভূষণ তাঁর **অশনি সংকেত** লেখেননি। অনঙ্গ বৌ, গঙ্গাচরণ, বা দীনু ভট্টাচার্য-এর মত চরিত্র অঙ্কিত হওয়ার আগেই অদ্বৈত (বিশ্বেশ্বরবাবুর পত্নী, ছাত্র নরেশের মা) ও ধনঞ্জয় ঘোষালের এক চমৎকার এপিসোড এঁকে দিয়েছেন। ক্ষুধার্ত ধনঞ্জয় ঘোষালের ভোজন পর্ব ও দৃশ্যটিকে আমরা তাই **অশনি সংকেত**-র দীনু ভট্টাচার্য-এর ভোজন দৃশ্যের পাশাপাশি রেখে দেখতে চাই। অদ্বৈতের গল্প —"ও সে অনেক কথা। তখনকার ছিল আজকালকার এল -এর দাদা। কত কিছুই না তখন ছেলেরা শিখিত; আর ... মনের ঝোলটা হয়েছে অতি উৎকৃষ্ট। মা - বলিয়া ক্রমশঃ কয়েকটি গ্রাস মুখে আবার তাহার গল্প আরম্ভ করে। — কত বামুন কায়েতের ছেলেকে যে মানুষ তাহার ইয়াত্তা নেই। ... জীবনের অপরাহ্ন — বাকি দিন কটা এই কাজেই পারিলে তাহার আজন্ম সাধনা সফলতা লাভ করে।" *অশনি সংকেত* দেখা

ভট্টাচার্য কাঁসার বাটি থেকে গুড়টুকু চেটেপুটে খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে— গুড়ের মুখ এবার আর দেখিনি।... আগে আগে পণ্ডিতমশায়, গুড় আমাদের হতো না। মুচিপাড়ার বানে খেজুর রস জাল দিত। ঘটি হাতে করে গিয়ে দাঁড়ালি একসের গুড় এমনি খেতে দিত। সে সব দিন যে কোথায় গেল।" দুটি দৃশ্যে

ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ দুটি এবং গিন্নীমা ও অনঙ্গ বৌ একই টাইপের। এক পক্ষের খেয়ে সু
পক্ষের খাইয়ে সুখ। ক্ষুধার্তের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন ও বাঙালির গৃহধর্ম অতি
বা ব্রাহ্মণ ভোজন মানবিকতার স্পর্শ পেয়ে যায়। আবার ধনঞ্জয় ও দীনু ভ
স্মৃতিচারণার পার্থক্য গল্প দুটির সময় কালকেও ভিন্ন করে দেখায়। অদ্বৈতের
ঘোষাল দরিদ্র, বৃদ্ধ,স্কুল উঠে যাওয়ায় ক্ষুধা মেটাতেই ছাত্র সন্ধানে ক্ষুধা
গোয়েন্দাগিরি তাকে করতে হয়, কিন্তু শিক্ষকতাই তার জীবনসাধনা বলে সে
করে। সে জীবন সাধনার নমুনা গল্পকার একটু পরেই দিয়েছেন। শিক্ষকতা অপে
নিয়ে মেতে থাকা । মূঢ় আত্মঘোষণা তার শিক্ষকতার বড়ো অন্তরায়। ১৯৩৫
গ্রামে এ ধরনের গল্পপ্রিয় ব্যর্থ শিক্ষক কিছু কম ছিলেন না। কিন্তু **অশনি সংকে**
হয় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পরে। স্বভাবতই দীনু ভট্টাচার্যের কাছে স্মৃতি বলতে
হিসাবে পূজা-পাঠের অহংকার নয়, ক্ষুধার্তের অন্নসুখের স্মৃতি। কিন্তু ধনঞ্জয়
দীনু ভট্টাচার্য কিংবা ব্রাহ্মণ বীরেশ্বরের স্ত্রী ও অনঙ্গ বৌ- এরা আমাদের গ্রাম
অতি পরিচিত চরিত্র।

তবে গল্পটি চরমোৎকর্ষে পৌঁছে গেছে মধ্য পর্বে। এই অংশকেই গল্পটির শীর্ষ
যায়। কথায় বলে, বার্ধক্যে শৈশব— কৈশোর ফিরে আসে। অথবা স্বভাবের
কোথাও একটা শৈশব আজীবন আত্মগোপন করে থাকে। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যে
পাঠককে পৌঁছে দেন আশ্চর্য চাওয়া-পাওয়ার দৈন্যতার সূত্র ধরে। নরেশের চ
ফাঁকি দেওয়া আর শিক্ষক ধনঞ্জয়ের কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ একড
একটু গুড় আর দুই পয়সার তামাক। এই সরল ও অসামান্য প্রত্যাশাগুলিই জীব
প্রান্তকে শৈশব নামক গ্রন্থিতে বেঁধে ফেলে। জীবনের শৈশব দশা কখনও ঘোচ
ছাত্রদশাও। তবু কি প্রাণান্তর প্রচেষ্টা আমাদের শৈশবকে গোপন করে, শিক্ষা
দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠার। ফাঁকি যার স্বভাবে বৃদ্ধ হলেও শৈশবে ফিরতে তার
বৃদ্ধের স্মৃতিচারণকে সামনে এনে নরেশের ফাঁকি দেওয়ার কৌশলকে
অদ্বৈত কি দুটি জীবনকে একটি জীবনেরই দুইরূপ— এই ধরনের একটা
পাঠককে উপহার দিচ্ছেন না! নরেশের আজকের ফাঁকিবাজি কি আগমীর
মিথ্যা অহংকারের আভাস দেখায় না কিংবা ধনঞ্জয়ের ব্যর্থতা, মিথ্যা অহংকা
কি নরেশের মধ্য দিয়ে দৃশ্যযোগ্য হচ্ছে না! বেশ নাটকীয় কৌশলে অদ্বৈত
আশ্চর্য সমীকরণটিকে উপস্থাপন করেছেন —

"সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই ধনঞ্জয়ের বড় ক্ষুধা পায়। সে অন্যসব সহ্য
পারে, গালমন্দও নির্বিকার চিত্তে হজম করা তার অসাধ্য নয়। কিন্তু ক্ষুধা সে সহ্য

না। এই সময় রোগটা একটু বাড়ে। পিটিয়া মানুষ করবার দায়িত্ববোধটা এই সময় হইয়া উঠে। ক্রোধ সম্পূর্ণ গিয়া পড়ে নরেশের উপর...

কি ভাবিয়া নরেশ এক দৌড়ে বাহির হইয়া যায়, মাস্টারের কাছে বলিয়াও যায় না। হাতে পাইলে খুন করিয়া ফেললেও বিচিত্র নয়...

পরেই দেখে, নির্লজ্জ ছেলেটা একডালা মুড়ি আর গুড় লইয়া হাসিমুখে হাজির! বুড়ার সর্বাঙ্গে পুলক শিহরণ বহিয়া যায়। অনেক বুড়ার স্বভাব ঠিক শিশুর মত কিনা!

পড়াইতে পড়াইতে বুড়ার ঘুম আসে বড়ো আরামের ঘুম। আবেশে চোখের পাতা আসে।... কৌতুকী ছেলেটা ডাকে, মাস্টারমশাই, অ মাস্টারমশাই!

নিদ্রার ভারি ব্যাঘাত হয়। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মুখ খিঁচাইয়া দুই চাইতে চায়। তারপর রাগ পড়িয়া আসে। বলে, শিখেছিস পড়াটা? বল, আর্যটা।

বলিতে পারে না। মাস্টার কাঠের রোলারটা লইয়া তাহার ডান হাতে মৃদু মৃদু করিতে থাকে। সে ক্ষিপ্র গতিতে বাম হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলে, এই হাতে মাস্টার মশাই!

ফিক করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, তোদের কি আমি মিছিমিছি মারি রে! মনের সাধ যে, তোদের পিট্টি দিই! পড়া লিখবি না, তা একটু আধটু মারব না

বিগলিত হইয়া বলে, মাস্টার মশাই, তামাক সাজিয়া আনি?

এই সূক্ষ্মদর্শী বালকটির প্রতি স্নেহে বুড়াটির প্রাণ মন আপ্লুত হইয়া উঠে। প্রাণ আশীর্বাদ করিয়া তাহার সমস্ত বালাই টানিয়া আনিতে চায়। মুহূর্তে তাহাকে তুলিতে চায়।" — এমন নাটকীয় অথচ সাবলীলভাবে মানসকূটৈষণার প্রকাশ গল্পটিকে আধুনিক করে তোলে।

মধ্যে যে ট্র্যাজিক বেদনাটি গল্পটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে সেই কথাটিও না না। ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ধনঞ্জয়ের আর একটি প্রত্যাশাও ছিল। পৃথিবীতে নিজের বলতে কেউ নেই, কিন্তু একটি দুর্ভাবনা তাকে তাড়িত করে। যেন একাকী শূন্য চোখে চলে যেতে না হয়। এক পরিবার বা আত্মীয় স্বজনে

ভরা অনেক জোড়া সজল চোখে না হোক, অন্তত পরিচিত কয়েকটা মুখ, যেন এ
আত্মীয়তা, সহমর্মিতাকে সঙ্গী করে অদৃশ্যলোকে যাত্রা করতে পারেন। প্রত্যাশাটি
বড়ো না হলেও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের কাছে দুঃপ্রাপ্য। একবার মৃত্যু মুখে সেই দুর্মর প্রত
পূরণের প্রাপ্তি নিয়ে, আনন্দ নিয়ে ফিরে এসেছে বলেই এই পরিবারের কাছে
কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বীরেশবাবু ও গিন্নীমার কৃতজ্ঞতায় ক্ষুধা ও আত্মীয়তা প্রার্থনা
প্রত্যাশাই পূর্ণ হয়েছিল বৃদ্ধের। লোভাতুর হয়ে পড়েছিলেনও সেকারণেই একটু
কিন্তু স্বভাব ধর্মকে কাটিয়ে উঠতে না পারায় প্রথমবার শিক্ষকতার ব্যর্থতা
দাতার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে রেহাই পেয়ে গেলেও, পুনরায় নরেশের পরীক্ষার ফল
ভাল না হওয়ায় সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় গৃহশিক্ষককে বিতাড়নের সিদ্ধান্তই
হল। অপমানিত হতে হল শুধু বীরেশ্বরবাবুর দ্বারা নয়, এমন অপমান অনেকবার
হজম করেছেন কিন্তু গিন্নীমার মুখ ফিরিয়া নেওয়া বৃদ্ধের সমস্ত প্রত্যাশাকে স
ভেঙে দিয়েছে। সে বেদনা প্রকাশযোগ্য নয়, তার শব্দ গল্পকার পাঠককে
আভাসে, ইঙ্গিতে—

"গিন্নীমা চোখ বুজিয়াই মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া চলিয়া যান। সে মুখে ঘৃণা কি
ধনঞ্জয় স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। এইবার ধনঞ্জয়ের মনে বড় রকমের একটা
বাধে। গিন্নীমার আজ কি হইয়াছে? তার খুকিটার না হয় অসুখ করিয়াছে, তাঁর
বোনটি না হয় বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। এজন্য ধনঞ্জয়ের অপরাধ কি! সে কেন উ
থাকিবে! অবশেষে আপনা হইতেই এই খটকার মীমাংসা হইয়া যায়।

বহুদিনের সেই জীর্ণ পুটুলিটা আবার বক্ষে তুলিয়া লয়।

চল্লেম বাবু আপনাদের অনেক বিরক্ত করেছি, সব ক্ষমা করবেন।

বাবু মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিলেন, এস গিয়ে।

এই নিদারুণ ঔদাসীন্যে ধনঞ্জয় চোখের জল রাখিতে পারে না। বাহির হয়ে পড়ে
মাঝে, নিরুদ্দেশের পানে..."

এই নিরুদ্দেশ যাত্রা যে গল্পের পরিসমাপ্তি নয় তা সহৃদয় পাঠক মাত্রই বুঝবে
বুঝবেন, ধনঞ্জয়ের গোয়েন্দাগিরির কারণ মাত্র একটি - ক্ষুধা নয়, একটা স্নেহ
এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধকে বড়ো একাকী করে রেখেছে, এক অব্যক্ত বেদনা ধনঞ্জয়ে
ত্রুটি, অযোগ্যতা, মূঢ় অহংকার, মিথ্যাচার, ব্যর্থতাকে ঢেকে দেয়। তাই ধনঞ্জয়ে
আসা শুধু ফিরে আসা নয়, এক অব্যক্ত বেদনার মুর্চ্ছনা— "এ যেন বিশে

[illegible] মাতৃহৃদয়ের দ্বারদেশে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে! গিন্নীমার মুখ-খানাও [illegible] এমন আকার ধারণ করিয়াছে - যেন বিশ্বের চিরন্তন মাতৃমূর্তি অজস্র [illegible] তৃষিত সন্তানকে অভয় দিতেছে।

[illegible] ন্যায় বসিয়া পড়ে।

[illegible], শিগ্‌গির ওখানে বস গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

চার

[illegible] থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায়দিন ছক বদল করে চলেছে। ইউরোপের [illegible] পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে মুহূর্তে। আমেরিকাও প্রয়োজন মত অবস্থান [illegible] সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এশিয়ার নবোদ্ভূত শক্তি জাপনের অংশ গ্রহণ। ঘটনা [illegible] বদলাতে শুরু করল যখন জার্মানি তার প্রতিবেশীদের আক্রমণ করা শুরু [illegible] ১০মে, জার্মানি-হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ল্যাক্সেমবুর্গ আক্রমণ করে। ১০জুন, [illegible] ব্রিটেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রীস, ইতালি আক্রমণ করে [illegible] অক্টোবর। ১৯৪১-এর ৬-ই এপ্রিল ব্রিটেন ও জার্মানি যৌথভাবে গ্রীস ও [illegible] আক্রমণ করে। এই প্রতিনিয়ত মানচিত্র বদলের মধ্যেই যুদ্ধ আরও জটিল [illegible] ২২শে জুন জার্মানি সোভিয়েত আক্রমণ করায়। ডিসেম্বরে জাপান আক্রমণ [illegible] হারবার। যুদ্ধের এই সমীকরণ বদলের ফলে প্রায় প্রতিটি দেশেই একাধিক [illegible] যুদ্ধবন্দিরা। কারা কখন মুক্তি পেয়ে যাবে অথবা কারা একদেশ থেকে অন্য দেশে [illegible] যাবে কিংবা বন্ধু সৈন্যদের দ্বারা হঠাৎ-ই বন্দি হয়ে যাবেন তার ঠিক ঠিকানা [illegible] লর্ড সভায় ভরতবর্ষকেও যুদ্ধরত দেশের তালিকায় যুক্ত করার ঘোষণায় [illegible] চরম অস্থিরতা ও আশঙ্কার ঘন মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে। দৈনিক পত্রগুলি তো [illegible] সাপ্তাহিক, মাসিক বা নিতান্ত ছোট ছোট পত্রিকার সাংবাদিক, সম্পাদকরাও তখন [illegible] খবর সংগ্রহ করে দেশবাসীকে জানাতে তৎপর। তেমনি একটি সাপ্তাহিক [illegible] কর্মচারী অলিখিত সম্পাদক আবু মিঞাও বন্দি। যুদ্ধ বন্দি নয়, যুদ্ধের খবর [illegible] সাজানোর চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ায় গ্রামে স্ত্রী-পুত্র- কন্যাদের কাছে ঈদের [illegible] যেতে না পারায় কলকাতা শহরেই বন্দি বিহঙ্গ হয়ে পড়েছেন আবু মিঞা। [illegible] বন্দি বিহঙ্গ। ন্যাৎসি বাহিনীর স্টালিন গ্রাড আক্রমণের সংবাদে গল্পটির [illegible] স্পষ্ট। গল্পকার গল্পটিকে প্রতিবেদনের হাত থেকে রক্ষা করবেন বলেই [illegible] করেছেন প্রতীকি, আবু মিঞাকে উপস্থিত করেছেন শহর কলকাতায় বন্দি [illegible] রূপে। স্ত্রী জামিলা চিঠি লেখে ভারি সুন্দর। এই চিঠির ভিতর দিয়ে আবু

মিঞা শহরের অবরুদ্ধ আকাশের ফাঁকে চোখ রেখে ফিরে যেতে পারে তার
আসা গ্রামে।

গল্পটিতে অদ্বৈতের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা বড়ো ঘনিষ্ঠ। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র
প্রতিষ্ঠিত সংবাদ পত্র নবশক্তির সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু প্রেমেন্দ্র
সমস্ত কাজ করতেন নবশক্তির কর্মচারী অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অদ্বৈত এক হাতে
সামলান অপর হাতে নিজের সংসার না করলেও বিধবা দিদি ও দুটি অসহায় ছে
ভাগ্নেকে বড়ো করে তোলার জন্য অর্থ পাঠানো ও তাদের সুস্থতার চিন্তায়
থাকতেন। আর তিতাস,তিতাসের সংলগ্ন মাঠ-ঘাট, গ্রাম-প্রতিবেশীদের
প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরেছে মালো সমাজের একমাত্র নাগরিক প্রতিনিধি অ
আবার সাংবাদিক হিসাবে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিটি খবর থাকত অদ্বৈতের নখদর্প
বন্দি বিহঙ্গ -এ আবু মিঞায় লেখক ব্যক্তি জীবনেরই প্রক্ষেপণ ঘটিয়েছেন।
সংলগ্নতা, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে উধাও হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা-স্পৃহা, কবিমনে
অনুসঙ্গ গল্পটিকে এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সূত্রে বেঁধেছে। জীবনানন্দের কবিতা, জে
নন্দীর গল্পের সঙ্গে অদ্বৈতের এই গল্পটির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। জমিলার
আবু মিঞার অতৃপ্ত প্রেমিক মনটা শান্তি খুঁজে পায়, তাই বার বার মনে প
ছেলেমানুষিতে ভরা চিঠি। চিঠির ছত্রে ছত্রে শুধু জমিলাকে দেখে না, দেখতে
গ্রাম্য প্রকৃতি, প্রতিবেশীদের অভাব দারিদ্র্য-দৈন্যতার ছবি আ র ক্রমাগত দুষ্টু
দুটি ছেলে মেয়ের শান্ত মূর্তিটি। গল্পটিকে অদ্বৈত বেঁধেছেন এক পোয়েটিক
(Poetic Monologue)। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুদ্ধ প্রসঙ্গ
তাৎপর্যপূর্ণ নয় এ গল্পে। নিতান্ত একটি বিবৃতি মাত্র। কিন্তু গল্পকার পাঠককে
করেন আবু মিঞার ভাবনার দিকে চোখ ফেরাতে।

একপ্রকার Dramatic Irony অদ্বৈতের গল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সংবা
অনেকেই আসেন নিখোঁজ সদস্যদের খবর ছাপানোর অনুরোধ নিয়ে। আবু
দুর্ভাগা মনে হয় তাদের , যেসব বাবারা ছেলের হারিয়ে যাওয়ার খবর ছাপাতে
-মিনতি করে। আবু মিঞার শহরবন্দি পিতৃসত্তাটি এবার চঞ্চল হয়ে পড়ে
কিভাবে লক্ষ্য রাখে সংসারের সব কাজ সামলে, যদি তার ছেলেরাও নিঁ
যায়। রমু-জমু-আরপান্না- "এরা এখন কোথায়? নিশ্চয়ই সেই পেয়ারা তলা
নিতে এসে যদি (জমিলা) দেখে ওরা সেখানে নেই! সেখানে নেই, পুকুরে
পাড়ে নেই, পাড়ার বারোয়ারি তলায় নেই- কোথাও নেই। তারা হারিয়ে গেছে
জমিলার কেমন লাগবে। - চিঠিতে খবরটা জানতে পেরে আবু মিঞারই
লাগবে।

[illegible] করে। হাতের কলমটা স্তব্ধ হয়ে যায়। চিবুকে দুখানা হাতের চেটু রেখে আবু [illegible] কোনো একদিকে চোখ মেলে দেয়। চারদিক পাক দেওয়াল। জানলার দিকে [illegible] হলে কষ্ট করে ডান দিকে ঘাড় ফেরাতে হয়। বিশেষ কিছু দেখা যায় না। দেখা যায় [illegible] পাশের জুবেনাইল জেলের উঁচু পাঁচিল আর তারও উপরের কাঁটা- তারের [illegible] সারি। অনেকগুলো ছেলেকে এরা এখানে আটকে রেখেছে। ছেলেদের [illegible] তারা দুষ্টু। রমু, জমুও খুব দুষ্টু।... এই জেলের ছেলেরা পালাতে পারছে না, কত [illegible] তারও উপরে কাঁটাতারের বেড়া। ছেলেরা বন্দি। রমু-জমু ও-কি বন্দি? এ [illegible] কি আমাদের জন্য পালাতে পারছে না। আমার জন্য আর জমিলার জন্য। [illegible] ছেড়ে দিলে এরা কি নদীর পাড় ধরে বনের রেখা ধরে আকাশের কোন ধরে [illegible] চলে যেত? জমিলা তাহলে কি করে? আমি তাহলে কি করি?"

[illegible] বন্দি মুক্তির ভাবনা যুদ্ধ তাড়িত পৃথিবীর ছায়া মিশিয়ে দেয় গল্পে। দ্বিতীয় [illegible] ইতিহাস বলছে, এই যুদ্ধে যুদ্ধ বন্দিদের একটা বড়ো অংশই ছিল শিশু ও [illegible]-পনেরো-ষোল বছরের বালকেরা। সাংবাদিক আবু মিঞা তা জানতেন বলেই [illegible] তাকে এভাবে তাড়িত করেছে। তাছাড়া রোমান্টিক মন বন্দিত্ব মানতে [illegible] না। মুক্তিকাঙ্ক্ষা আবু মিঞা তথা অদ্বৈতের আত্মস্বরূপ। তার সঙ্গে মিশে গেল [illegible] অভিজ্ঞতা লব্ধ যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিকাঙ্ক্ষার দুর্মর আশা। এই বিশেষ [illegible] আরও ব্যঞ্জনাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে জমিলার *শেষ চিঠি বা গল্পশেষের* [illegible]। শেষ চিঠিতেও আছে সামান্য নাটকীয় উৎকণ্ঠা। জমিলা লিখেছে ছেলে [illegible] এক কাণ্ডের কথা। আবু মিঞার পিতৃসত্তাটি এই সংবাদে প্রবেশের পূর্বেই [illegible] ওঠে। কি ইঙ্গিতময়, চাতুর্যে ভরা জমিলার এই চিঠি। জমিলা লিখেছে পাখিটা [illegible] গেল। আবু মিঞা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে তার। কোন [illegible] কথা জানিয়েছে জমিলা। বন্দির কাছে মুক্তির দুই রূপশাসনের হাত থেকে [illegible] বা মৃত্যু অথবা শাসকের বোধোদয় বা বদান্যতায় সত্যকার বন্ধন উন্মোচন। [illegible] একটা উৎকণ্ঠা তৈরি করেন গল্পকার। কিন্তু জমিলার চিঠির শেষ বাক্যটি বুঝিয়ে [illegible] ব্যঞ্জনা আকাশচুম্বী। জমিলা লিখেছে—

[illegible] তোমার ছেলে দুটো করলো কি, না একটা পাখি ধরে আনলো! এনে খাঁচায় [illegible] খাঁচার বন্ধনে পড়া পাখিটা লাগল ছটপট করতে, খাবে না, নাবে না, কিছু [illegible], খালি খালি ডানা ঝাপটাবে।

[illegible] তোমার মেয়েটা করল কি, না খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিল।" —

একটি প্রেমিকের বিরহকে সামনে রেখে অদ্বৈত গল্পটিতে যুদ্ধবিরোধী শ
পাখিটিকে আকাশে মুক্তি দিয়ে যুদ্ধোন্মাদ পৃথিবীকে আশ্চর্য একটি বার্তা পৌঁছে
চাইলেন পৃথিবীর এই প্রান্তে বসে। যুদ্ধের পটভূমিকায় সমকালীন বিশ্বে এ গল্প
অনন্য নজির।

পাঁচ

হিটলার প্রতিবেশী দেশগুলিকে আক্রমণ করায় যুদ্ধের বাজারে বাংলাদেশে কাগ
দাম বেড়ে যায়। এক টুকরো কাগজও রাস্তায় পড়ে থাকার জো নেই। ফলে
কলকাতার কুলি মজুর বা ভিখারিদের জীবনযুদ্ধ চরমে উঠেছে। বৈদান্তিক দর্শ
পীঠস্থান এই ভারতভূমি তবু বুভুক্ষু বঙ্গবাসী অভাবকে নিত্য সঙ্গী করে তুলে তাকে
করতে পারে না। কৃপা প্রার্থনার দৈন্যতা থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে পারে না।
১৭৭৬-এর মন্বন্তরের দেড়শ বছর পরে যখন বাঙালিরা আরও একটা দুর্ভি
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন ভিক্ষাবৃত্তির দৈন্যতা কাটিয়ে ভজার পশুগোত্রীয় হতে চা
বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। পথকুকুর খেঁকির দল যেভাবে অভাব, লা
অপমান নিষ্ঠুরতাকে গা-সওয়া করে নিতে পারে, ভজারা তা পারে না। ভজাদের
যুদ্ধের সময় বিশ্বের দেশে দেশে, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত কে
শহরে শহরে পশুদের মত হলেও, ভজারা পশুগোত্রে ফিরে যেতে চাইলেও, কো
যেন একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়। পশুরাও আতঙ্কিত হয়, আশ্চর্য হয়, মানু
এভাবে নীচে নেমে যেতে দেখে, তারা বিস্মিত হয়, কোনোভাবে মেনে নিতেও
না। মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করবে মানব
লেখক তা কল্পনা করবেন কিভাবে! যদি ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশাতুল্য মর্যাদা দেওয়া হ
এ ব্যাপারে সমস্ত সংকোচ দূর হয়ে যায়, চুরি বা দস্যুতার সঙ্গে তার ভেদ না থাকে
তা দানবীয় বা পশুতার নামান্তর। **এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়** - প্রবন্ধে অ
দৈন্যতাহীন *ভিক্ষাবৃত্তিকে* তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। *স্পর্ষদোষ* গল্পটির শিরো
দেখেই মনে হয় অদ্বৈত এই নামকরণেই একটা ব্যঙ্গের ছোরা গোপন করে রেখে
খেঁকীকে দেখে ভজার খেঁকীর মত ভঙ্গিতে তাকে আক্রমণ কি ভজার কৌতুক
সঙ্গদোষের মত স্পর্শদোষ ! তাহলে খেঁকীর আচরণের সঙ্গে ভজারূপ ভিখারী
আচরণের পার্থক্য দিয়ে গল্পের সূচনা কি স্পর্শদোষে ভজার কুকুর হয়ে যাও
প্রতিষ্ঠা করার জন্য! মোটেই তা নয়, ভজার খেঁকীর মত আচরণ মানব সভ্যতার
এক তীব্র ব্যঙ্গ। বিশ্বজোড়া সম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা, অমানবিকতা, যুদ্ধবাজ, মুনাফা
ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের শিকার লক্ষকোটী মানুষ পশুদের ভঙ্গিতে মানু

[illegible]কে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে। তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে চাইছে। মানবিক বোধের [illegible] সজোরে আঘাত হানে এই গল্প।

[illegible] উৎস সম্পর্কে জানা যায় অদ্বৈত যখন মোহাম্মদীতে কর্মরত তখন তাঁর সহকর্মী [illegible] শৈলেন রায় ; দুজনে একই বাসায় থাকতেন। একদিন শৈলেন রায় বাসায় ফিরে [illegible] এক ভিখারিকে কুকুরের ভঙ্গিতে চার পায়ে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে যেতে [illegible]। অদ্বৈত বলেন মানুষটি পশু হয়ে গেছে। — এ সংবাদ আসলে অদ্বৈতের [illegible] মর্যাদাবোধকেই আঘাত দিয়েছিল। কোন বাস্তবতা মানুষকে এই হীনতার পর্যায় [illegible] হিটলারের প্রতিবেশি দেশগুলিকে আক্রমণের সংবাদ দিয়ে লেখকপাঠককে [illegible] ইঙ্গিত দিয়েছেন। পার্কস্ট্রীটের ফুটপাথের সরুগলিতে খেঁকীর সঙ্গে ভজার [illegible]— একটা মহাপতনের শব্দ। এ শব্দ সাধারণ লোকে শুনতে পান না, পান [illegible] মত লেখকেরা। এরপর যথারীতি খেঁকী ফিরে যায় খেঁকীর দলে, ভজাও [illegible] ও কুলি মজুরের দলে। দ্বিতীয় সাক্ষাতে দেখা যায় খেঁকী ও ভজা পরস্পরের [illegible]। ভজার মুড়ির ঠোঙা ফাঁক তালে খেঁকী মুখে নিয়ে পালাতে গেলে ভজা ও [illegible] মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। ভজা মুড়ির ঠোঙা পুনরুদ্ধার করে বটে খেঁকীও সশব্দে [illegible] আক্রমণ করে। কাগজের মোট ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলে খেঁকী আরও [illegible] হয়ে ওঠে। অবশেষে ভজা গ্রহণ করে পশুভঙ্গিতে খেঁকীকে আক্রমণ। এমনকি [illegible]ও অনুকরণ করে। গল্পকার একবাক্যে ব্যঙ্গের চাবুকটি পাঠকের সামনে [illegible] "খেঁকী উহার মধ্যে নিজের স্বরূপ দেখিয়া পিছাইয়া গেল।"— খেঁকী কি তবে [illegible] মানবিকসত্তাকে সম্মান জানাতেই লড়াই থেকে সরে দাঁড়াল। একটা বিপরীত [illegible] কি অন্তরপাঠে উঠে আসে না—মানুষের সভ্যতা যেখানে মানুষকে লাঞ্ছিত [illegible] পীড়নে পশুতে পরিণত করছে, সেখানে প্রকৃতই একপথ কুকুর ভজার [illegible] হতচকিত হয়ে সম্মানে সরে দাঁড়াচ্ছে। আর একটি ইঙ্গিত পাঠক খুঁজে [illegible]— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি তবে পাশব শক্তির সঙ্গে পাশব শক্তির। নাকি পাশব [illegible] মানবিকতার। প্রশ্নগুলি ওঠা স্বাভাবিক। কারণ এরপর ভজা ও খেঁকীর ঘনঘন [illegible] ও ভজার একই আচরণ করার বিবরণের ফাঁকে গল্পকার যুদ্ধের সংবাদ [illegible] দিতে থাকেন। যেমন—

[illegible] দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।'

[illegible] হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আয়ত্তে আনিয়া প্যারিস আক্রমণ করিয়াছে।'

গ) 'মিত্রপক্ষের জয় ঘোষণারত খবরের কাগজ গুলিতে পাবলিক আর মৈত্রীর
খুঁজে না।'

ঘ) 'জনগণের নিভৃত কন্দরে অনুক্ষণ অনুরণন দিয়া যায় যদি বোমা ফাটে।'

ভজার জীবনে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। কাগজ কুড়ানোর শ্রমের বিনিময়ে
নির্বাহের চেষ্টাও সম্ভব হয় না। এবার সমস্ত আত্মসম্মান খুইয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ক
আর কোনো পথ নেই। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত বিভূ
দিয়েছিলেন মতিমুচিনীর মৃত্যুতে, অদ্বৈত তার আভাস দিলেন ভজার এই ভিক্ষ
অসহায় হয়ে মেনে নেবার মধ্যে দিয়ে।

গল্পের তৃতীয় অংশে এক অদ্ভুত সমীকরণের দিকে নিয়ে গেছেন গল্পকার। এই
কিছুটা অনুরূপ ছবি আমরা দেখতে পাই *নবান্ন* নাটকের তৃতীয় অঙ্কর একটি
যেখানে আস্তাকুঁড়ে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়িতে এক কুকুর কুঞ্জর হাতে কামড়ে
দুর্ভিক্ষে পশু ও মানুষ একই সারিতে দাঁড়িয়ে। হাড় জিরজিরে মানুষ ও কুকুর পর
সঙ্গে লড়াই করে, সুযোগ বুঝে এ ওর ভাগের অংশ ছিনিয়ে নিতে চায়। কৃত
মানবিকতা সেখানে বাহুল্য, অপ্রত্যাশিত। এই গল্পে দেখি সারাদিন হাজার
কাছে হাত পেতে একই উত্তর পেয়ে ক্লান্ত ভজা অবশেষে এক ভিন্নপ্রকৃতির
দাক্ষিণ্যে পেয়েছে একটা পয়সা। ক্ষুধার্ত বাঙালির সামান্যতম বাসনাকেও ব্যঙ্গ
ছাড়েননি গল্পকার — "পশ্চিমা লোক হইলে এক পয়সার ছাতু ও তিন ঘটি জল
দিন কাটাইয়া দিত। বিলাসী ভজা ঢুকিল তেলে ভাজার দোকানে।" একসঙ্গে ভজ
এবং আরও একটি প্রাণি— দোকানের শ্রমিক বালকটিকে এই দৃশ্যে জুড়ে দিয়ে দু
ছায়াকে বিস্তারিত করা হয়। বালকটি মালিককে ফাঁকি দিয়ে একটা জিলিপি
লোভে কেরোসিন কাঠের আড়ালে মাথা লুকিয়েছে, সেই সুযোগে ভজা অন্যম
ভান করে একতাল রুটি কনুইয়ের ধাক্কায় ড্রেনে ফেলে দিতে চেয়েছে অপরদি
পেতে বসে থাকা খেঁকী ড্রেনে পড়ার আগেই রুটির তাল মুখে নিয়ে চম্পট দি
ভজা ছুটে গিয়ে খেঁকীর কাছ থেকে একটা রুটি কেড়ে নিতে চাইলে অকৃতজ্ঞ খে
নখ এমন দেখিয়েছে যে ভজাকে এবার রণভঙ্গ দিতে হয়েছে। কিন্তু ভজাই ব
এই অকৃতজ্ঞতাকে মেনে নেবে কেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় মানুষ কি পশুর
পৈশাচিক হতে পারে না! ভজা এবার পৈশাচিক উল্লাসে মেতেছে। খেঁকী দেখলে
খেঁকীর ভঙ্গিতে এবার তেড়ে যায়। বিকৃত কণ্ঠে খেঁকীতে আক্রমণ করে —
তখন স্পষ্ট দেখিতে পায়, এ তো নেহাত খেলা নয় — ঠাট্টা নয়— ভজার চে

TABLE 2

[illegible]ভাবিক তীব্রতায় ঝলসাইয়া উঠিতেছে — দাঁতগুলি কড়্‌কড়্‌ করিয়া মানবিকতার [illegible] অতিক্রম করিতেছে।" — সচেতন পাঠক নিশ্চই এই যুদ্ধের বিপ্রতীপে দ্বিতীয় [illegible]দ্ধের পৈশাচিক উল্লাসের আঁচ পাবেন। যুদ্ধ বাধিয়েছে কয়েকটি ধনী দেশ কিন্তু তার [illegible]পাশে জড়িয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশকে, যারা নিজেরা ক্ষুধার্ত হয়েও পরস্পরের [illegible] পৈশাচিক যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়, [illegible]রিক পৈশাচিক আক্রমণের আর একটি নমুনাও মনে পড়তে পারে সুকান্তের *একটি মোরগের কাহিনী* কবিতায়। ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় মোরগের প্রতিযোগী [illegible]নিত মানুষের ভিড়। এগুলি সবই অদ্বৈতের ছোট — গল্পের সমসাময়িক।

[illegible] *স্পর্শদোষ* গল্পটি সর্বোচ্চ সীমাকে ছাড়িয়ে যায় শেষ দৃশ্যে। যুদ্ধের বিপরীতে [illegible]তার এমন প্রতিবাদ অদ্বৈতের শিল্পীসত্তার অনন্যতা বুঝিয়ে দেয়। খেঁকীর [illegible] ভজা খেঁকী অপেক্ষা হিংস্র, তার আক্রমণ থেকে ক্রমাগত জরাজীর্ণ হয়ে পড়া [illegible] সর্বদা নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এ কোন পৃথিবীতে লেখক পাঠককে [illegible] যেতে চান। যুদ্ধের বিকট হুঙ্কার মারণাস্ত্রের ভয়ংকর খেলা মানুষের সভ্যতাকে [illegible] পাশবিকতায় পৌঁছে দিয়েছিল— ভজা যেন তার রূপক। খেঁকীই যেন তখন [illegible]পীড়িত মানুষ আর ভজা হিংস্র দানব। ভজার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত খেঁকী উপায়ান্তর [illegible] নিরীহ এক পথচারীকে কামড়ে দিয়ে পাগল প্রতিপন্ন হয়। বীরপুঙ্গব মানবের [illegible] কুকুরটাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে পথের মাঝখানে ফেলে বীরত্বের ঘোষণায় [illegible] করে। আর সকলকে চমকে দিয়ে খেঁকীর প্রতিদ্বন্দ্বী ভজা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে [illegible] খেঁকীকে বুকে তুলে নিয়ে নিজেও পাগল প্রতিপন্ন হয়। যুদ্ধ মানুষকে অভাব [illegible], দারিদ্র্য দিয়েছে, মানবিক সম্ভ্রম-মর্যাদা আত্মবোধ সমস্ত কেড়ে নিয়ে পশুতে [illegible] করেছে, পশু অপেক্ষা হিংস্র করে তুলেছে, অবশেষে যুদ্ধোন্মাদ বীরপুঙ্গবদের [illegible] এই ক্ষুধাত মানুষেরা ক্ষুধাতি পাগল বলে চিহ্নিত হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় [illegible] জুড়ে চলা হিংস্র দানবীয় যুদ্ধকে আর যুদ্ধে আক্রান্ত বিশ্বের কোটি কোটি [illegible] মানুষের অসহায় নির্মম ট্র্যাজেডিকে একটা ছোটগল্পে রূপবদ্ধ করে অদ্বৈত তাঁর [illegible] মহোৎকর্ষতাকেই দেখিয়েছেন।

ছয়

[illegible] বিবাহে সবচেয়ে বেশি উল্লাস পায়। বিবাহ করিয়া সুখ, দেখিয়া আনন্দ। [illegible] যে করিতেছে তার তো সুখের পার নাই। পাড়ার আর সব লোকেরাও মনে করে, [illegible] দিনটা অতি উত্তম।

যারা সবচেয়ে প্রিয়, যারা সবচেয়ে নিকটের, তাদের বিবাহ করিয়া বউ লইয়া আ
আহ্লাদ করিতে দেখিলে মালোরা খুব খুশি হয়। যে বিবাহ করিতে পারে না, সে
কাটায় নৌকাতে। এ পাড়ার গুরুদয়াল সেই দলের।"—তিতাসের এই গুরুদয়াল বি
করতে না পারলেও *কান্না* গল্পের নায়ক গুরুদয়াল মালোপুতের মতই, বি
ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তিতাসের গুরুদয়াল কালোর ভাই রমানা
সঙ্গে তর্ক করেছিল তিন বিবাহের তিন ছেলের বাপ শ্যামসুন্দর ব্যাপারী আবার এ
বিবাহ করতে পারে না, তাহলে পূবের চাঁদ পশ্চিমে উঠবে। রমানাথ বলেছিল ক
কারবার করে ব্যাপারী অত টাকা করেছে শেষে বালিশ বুকে জড়িয়ে রাত কাটাবে
নাকি! —বাস্তবিক রমানাথের কথাই ঠিক হয়েছিল, শ্যামসুন্দর ব্যাপারী নাতনির ব
মেয়েকে ফের বিয়ে করেছিল। — সে তো ঠিক, অর্থ বেশি থাকলে বার বার
করাটা কোন সমাজ আর বাধা দেবে। কিন্তু *কান্না* গল্পের গুরুদয়াল ধনী নয়।
গুরুদয়ালের সকলকে চমকে দিয়ে বিগত বউ-এর স্মৃতিকে বুকে নিয়ে পুনরায় বি
উদ্যোগ নেওয়া অথবা বিয়ে করার—ভিন্ন ধরনের তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়।

প্রেম-বিবাহ-স্নেহকাতরতা ও রিরংসা মেশানো এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্প *কান্না*।
প্রেমে নিমগ্ন বিপত্নিক গুরুদয়ালের স্বেচ্ছাচারিতা দিয়ে গল্পের সূচনা। আপন
আপনি অধীশ্বর। বন্ধন বলে কিছু নেই। ঘরে মন টেকে না, সারাদিন পথে পথে
সন্ধেবেলা নিমগাছের তলায় পা ছড়িয়ে আপন মনে গান গায় - "রাধে, রাধে
রাধে,/ তোর লাগি মোর পরাণ কাঁদে ; / নইলে কী আর কাঁদে শশী/ অতি সাধের
বাঁশী/ তাই চরণে তুলে দিল সাধে/ রাধে, রাধে গো রাধে —।" পাড়া প্রতি
গুরুদয়ালের ছন্নছাড়া দশার জন্য পত্নী হারানোর বেদনাকে দায়ী করে তাকে সহানু
দেখায়। গুরুদয়াল কথার ভঙ্গিতে জটিল মনের গোপন অভিসন্ধিকে লুকিয়ে রা
পত্নী হারানোর বেদনার কথা তুললে গুরুদয়াল বলে" —পাগল করলে দেখছি!
বল দেখি, চিরদিনের জন্য কে সংসারে আসে? গানে আছে না, জন্মিলে মরিতে
খাঁটি জানাশুনা, দুদিনের তরে কেন এতো বিড়ম্বনা! যে মরেছে, সে বেঁচেছে।" —
দার্শনিকতার আড়ালে গুরুদয়ালের উপবাসী মনটা যে আরও একটা নীড়
অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরের লোকেরা তার সন্ধান পাবে কিভাবে। লেখ
জানা নিবারণের বোনের ধারণা গুরুদয়ালের এই ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়া
এ হল ভ্রমণের আনন্দ। আবার মনুর মায়ের সাফ কথা — "থাকতো বউটা আজ
নাক ঝাড়ায় ওঠাতো আর এক মুখ নাড়ায় বসাতো। অমন করে ঘুরে বেড়ানো —
সাধ্যি ছিল কি, বাড়ির উঠান থেকে পা বাড়ায়।" — গৌরাঙ্গসুন্দরীর মা আরও উ

...ত আমার হাতে, ঝেঁটিয়ে—"। গুরুদয়ালের পিসীমার ধারণা বউ হারিয়ে সে ...পেয়েছে তা ভুলতেই ছেলেটা ধর্মে মতি দিয়েছে; তাঁর দুশ্চিন্তা কোন দিন ...-উন্মেসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে না যায়। এই অনুসারে পিসী শোকে কাতর হয়ে ...কাঁদে।

...লের মনের সন্ধান যে কেউ পায়নি সেটাই গুরুদয়াল প্রমাণ করে অনেক দেশ ...ফিরে এসে। নানা জায়গায় শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় যেমন ...শীলের চমকে দেয়, তেমনি সকলকে হতচকিত করে সে জানায়, সে বিয়ে ...স্ত্রী ঠিক করে এসেছে, এ প্রমাণ তার হাতে। ছন্নছাড়া জীবনের আশ্চর্য ...সকলের নজর কাড়ে। এবার গুরুদয়াল বেশ পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। এক ...বিয়ে করার জন্য গুরুদয়ালের উদ্যোগ, উদ্দীপনা কিছুটা দৃষ্টিকটুও দেখায় ...চোখে। কিন্তু গুরুদয়ালের যেন সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। হিতৈষীরা ...করে - "এ কোনো দেশী রীতিরে ভাই? এখনই এতটা মাখামাখি! বিয়ে হলে ...সে হয়তো থেকে যাবে।" প্রেমের জাদুকাঠিতেই যে গুরুদয়ালের এই ...-যখন সকলে এই ধারণায় পৌঁছাতে চায় তখনি গল্পকার আবার গুরুদয়ালের ...ও পাঠকদের সিদ্ধান্তকে পাল্টে দেন।

...পক্ষ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে গুরুদয়ালকে জানানো হয় কন্যার কর্তারা ...বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছে। বাস্তবিক এই আঘাত গুরুদয়ালের কাছে ...। লেখক লেখেন সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি - "কি এক উৎকট আনন্দে গুরুদয়াল ...উঠিল। এ যেন শ্মশানবাসীদের অট্টহাসি।" - এই উৎকট আনন্দই ইঙ্গিত ...তে শুধু বেদনা নেই একটা রিরংসার আভাস আছে। কিন্তু সেই রিরংসার, ...ধরন যে কত বিচিত্র হতে পারে গুরুদয়ালের পরবর্তী আচরণে গল্পকার ...উন্মোচিত করেছেন যে পাড়াপ্রতিবেশীর মত পাঠকদেরও বিস্মিত হতে ...সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেলেও গুরুদয়াল বিয়ে করে, বিয়ে করে আর কোনো ...— বউ বড়ো বিশ্রী। না আছে নাকের ডগা, না আছে চুলের বাহার, রংটিই ...। গুরুদয়ালের ব্যর্থ প্রেমের সমস্ত প্রতিহিংসা আছড়ে পড়ে বাপ-মা ...অসহায় মেয়েটির উপর। ফ্রয়েডীয় নিগ্রহামোদ (sadism)এর আনন্দে ...অত্যাচার দিনে দিনে সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যায়। এই আনন্দে আরও একটু ...গল্পকার আহ্লাদীর সঙ্গে পুনরায় গুরুদয়ালের সাক্ষাতের দৃশ্য এঁকে। ...ইতিহাসের বুকে গুরুদয়ালের সঙ্গে আহ্লাদীর অকস্মাৎ সাক্ষা, গুরুদয়াল ...আহ্লাদীর এখনো বিয়ে হয়নি। বিয়ের পাত্র নিতান্ত বুড়ো, আহ্লাদী সে

বিবাহে আগ্রহী নয়, এক প্রকার বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হতে
গুরুদয়াল আহ্লাদীর কাছ থেকে এত কথা জানলেও নিজের বিয়ের কথাটি
কুটিল মনের অভিসন্ধি অথবা প্রতিশোধ স্পৃহা আবার একটা ছলনার আ
আপাত মনে হয় আহ্লাদীর আহবানে সাড়া দিয়ে তাকে দেবদূতের মত উদ্ধ
হওয়ার মধ্যে গুরুদয়ালের প্রেমের পরিচয়ই ফুটে ওঠে। গল্পকারও এমন
বুলিয়ে রাখেন যে এর ক্রুরতাকে চোখে পড়তেই দেন না। প্রেম তো এক
কিন্তু আকস্মিক আঘাত বা প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য আর একজনকে যে
আনতে হয়েছে, নারীটি আঘাত পেয়েও সামান্যতম প্রতিবাদ করেনি তার
একটা করুণার বীজ যে অজান্তে গুরুদয়ালের মনে গজিয়ে উঠেছে গু
জানতে পারল আহ্লাদীর বিবাহের রাত্রে। আহ্লাদীর প্রেমের অমন অ
পরাজিত হল - " যে দিন আহ্লাদীর বিবাহ হইবার কথা, সেইদিন বিকালে
বেশ একটু সাজগোজ করিল। বউকে ডাকিল, বউ আসিয়া নতমুখে নিকটে
তাহার মৌন মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল
করিল একখানা কলমুখর অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ, আর একখানা নির্বা
বেদনায় মলিন মুখ। অন্যসময় হইলে,সে অনায়াসে বউটিকে পরিত্যাগ করি
যাইতে পারিত কিন্তু আজ তাহার কি যেন হইল, দুঃখদগ্ধ রূপহীন মুখখা
চাহিয়া কেবল ভাবিত লাগিল। ভাবিল, এটা বড় অসহায়।"

অদ্বৈত মনস্তত্ত্বেও মাষ্টার আর্টিস্ট। শুধু ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসা নয়, করুণা
মনকে প্রতিহিংসায় উত্তেজিত করে। তাই যার অসহায় মলিন মুখ দেখে
অতবড় ত্যাগ করল এবার সেই অসহায়াটির উপরই চরম হয়ে আছড়ে প
আক্রমণ। সেই রাতেই গুরুদয়াল বউ-এর গালে মুখে দুই চড় কষিয়ে
তারপর শুধুই অত্যাচার নয়, প্রকাশ্যে মৃত্যুকামনা, মৃত্যু আদেশ - কিছুই বা
প্রতিবেশীরাও অনুতপ্ত হয়ে বউটির মৃত্যুতেই মুক্তি কামনা করল। অবশে
মারাই গেল, তবে গুরুদয়ালের অত্যাচারে নয়, চণ্ডীমায়ের দয়ায়। এবার গু
কপাল চাপড়িয়ে কান্না। এই 'কান্নাও যে কত জটিল একটি মানসিক ক্রিয়া তা
দিয়েই গল্পটি শেষ করেছেন গল্পকার। কি আছে এই কান্নার পশ্চাতে - অস
মুখটির প্রতি ভালোবাসা! গল্পটি যে এত সবল নয় তা বোঝাতেই অদ্বৈত
"গুরুদয়াল আঁখির জলে ভিজিয়া ভিজিয়া যেন বলিতে থাকে, মরিলে তো
কটা দিন আগে কেন মরিলে না।" তার অর্থ এ-কান্নায় একটা ক্রুরতা মেশানো
শুধুই ক্রুরতা বা অভিনয়ই গুরুদয়ালের মনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, শুধু প্রে
করুণাও নয় - এসব পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[illegible] এই জীবন।' তাই গল্পের শেষ অর্ধ বাক্যটি চমৎকার ব্যঞ্জনাধর্মী 'সত্যিই কি তাই?'

[illegible]গল্পকার অদ্বৈতের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা ছিল না তা নয়। রচনারীতির দুর্বলতা [illegible] ক্ষেত্রেই চোখে পড়বে। তিতাসের ভাষার সারল্য, ধ্বনিমাধুর্য্য, সংলাপের [illegible]ত্রিম সজীবতা ছোটগল্পগুলিতে সেভাবে ছাপ ফেলেনি। ছোটগল্প ও উপন্যাসের [illegible]গত তফাৎ যেসব কথাকারেরা স্মরণে রাখেন তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় [illegible] ও উপন্যাসে তাঁদের ভাষাও উপস্থাপনা ভিন্ন প্রকৃতির। অদ্বৈতের স্বল্পতম রচনা [illegible] সেই পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। গল্পগুলি পড়তে পড়তে তিতাসের কথাকারকে চিনতে [illegible] ভুল হয় না, তবু কোথাও যেন অদ্বৈত গল্পে, বিশেষ করে নাগরিক দুটি গল্পে ব্যঙ্গ, [illegible] ব্যবহারে তিতাসের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে ছিলেন। [illegible]কালীন অবসর নিতে যদি তিনি বাধ্য না হতেন তাহলে নিশ্চয়ই ঔপন্যাসিক [illegible] পাশাপাশি ছোটগল্পকার অদ্বৈত মল্লবর্মণও নিজের স্থান স্পষ্ট করে নিতেন। এ [illegible] আমাদের বলার কথা ছিল এই - অদ্বৈতের ছোটগল্পগুলি নিছক এক তরুণ [illegible] মহৎ উপন্যাস রচনাল প্রস্তুতি মাত্র নয়। তাই এই জিজ্ঞাসা দিয়ে আমরাও শেষ [illegible] পরি-অদ্বৈত মহৎ ঔপন্যাসিক? মহৎ গল্পকারও 'সত্যিই কি তাই?'

TABLE 2

Part -II

(দ্বিতীয় ভাগ)

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে তরঙ্গিণী চরিত্র

ডঃ শুভময় ঘোষ,
অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

"যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি — তার একটি মূলসূত্র হলো প্রাণ ও মনের দ্বৈত, প্রকৃতি ও চৈতন্যর বিরুদ্ধতা" ('আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি' ঃ বুদ্ধদেব বসু)। প্রায় জন্মমুহূর্ত থেকেই বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যও ভর করে আছে আধুনিকতার এই স্বরূপে। কাব্যে যেমন, তেমনি উপন্যাস অথবা নাটকেও তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যকেই, কিন্তু সেই ছুঁতে চাওয়া প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিকে এড়িয়ে গিয়ে নয় - তাকে পেরিয়ে গিয়ে, উত্তীর্ণ হয়ে। বস্তুত, 'কাম'কে তিনি জেনেছিলেন জীবনের মূলাধার রূপে, কবিতায় জানিয়েছিলেন 'অমর, অফুরান, ধন্য তুমি কাম, মর্মমূলে বাঁধা ধ্রুবপদ'। [illegible], বুদ্ধদেব জানেন যে একদিন তারই 'উৎসের পাতাল ছুঁয়ে, আলোয় ব্যক্ত' হতে পারে মানুষ। তাই সাধারণ 'লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই [illegible]' কীভাবে 'পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত' হতে পারে দু-একজন মানুষ - তারই নিপুণ [illegible] দেখি তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যেও। আর এ নাটকে 'আধুনিক মানুষের [illegible] ও দ্বন্দ্ববেদনা' নিয়ে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে তরঙ্গিণী চরিত্রটি।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যে আছে পুরাণের এক মুখচ্ছদ। এর কাহিনী-বীজ রয়ে [illegible] একদিকে যেমন আর্য রামায়ণের আদিপর্বে, তেমনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারতের বনপর্বে ১১০ থেকে ১১৩ অধ্যায়ে। এরই মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনী। কিন্তু এই প্রাচীন পুরাণ কাহিনীতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের জন্য কোনো বিশেষ [illegible] কথা বলা হয়নি, তাদের কারোরই নেই কোনো নামপরিচয়। ব্যবহারেও তারা [illegible]। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ যখন 'পতিতা' (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) কবিতায় এই [illegible] কেন্দ্র করলেন, তখন একদল বারাঙ্গনার মধ্যে বিশেষ একজন উদ্দীপ্ত করেছে [illegible] জনাকে। যদিও নাটকীয় একোক্তিমূলক এই কবিতায় তার আত্মপরিচয়ে নামের প্রয়োজন হয়নি কোনো — "ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে পাঠাইলে বনে [illegible]জনা/সাজায়ে যতনে ভূষনে রতনে, আমি তারই এক বারাঙ্গনা" কেবল এটুকুই তার পরিচয়। সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধদেবের এই কাব্যনাট্যে প্রায় উদ্দীপনবিভাব হয়ে [illegible] রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের নামহীন এই 'পতিতা' তাঁর হাতে [illegible] উঠেছে 'তরঙ্গিণী' নাম পরিচয়ে, পেয়েছে এক বিশদ পটভূমি।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষীয় সমাজে - কুলটা, স্বৈরিণী, বারাঙ্গনা, বারস্ত্রী,

বারবনিতা, স্বতন্ত্রা, স্বাধীনযৌবনা ইত্যাদি শ্রেণীবাচক নানা নামের আড়ালে থা
গণিকারা যেমন আশ্রিত ছিল রাজ-ছত্রছায়ায়, তেমনি সেই নিরাপত্তার প্রতিদানে রা
হাতে ব্যবহৃত হয়েছে তারা নির্বিচারে। বস্তুত, পুরুষতান্ত্রিক সামাজের সংস্ক
গণিকার শরীর ও মন রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি —রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন পূরণই তার প্রথ
প্রধান কর্তব্য। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকেও রাষ্ট্রের হাতে ক্রীড়নক হয়ে র
তরঙ্গিণী, রাষ্ট্রেরই অধীনা সে। তাই যখন বীর্যের অভাবে অনুর্বরতা ও বন্ধ্যা
অভিশাপে ভুগছে অঙ্গদেশ, আকাশে 'জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু', আর অন্যদিকে 'ম
ফাটে বুক' 'দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য' - সে মুহূর্তে রাষ্ট্রের সেই বন্ধ্যাত্ব মোচনের
ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য-লুণ্ঠনের প্রত্যাদেশ হয়েছে তরঙ্গিণীর ওপর। কেননা, সে
'রাষ্ট্রের মতো পৌরুষ' 'তীব্রতম যৌবন'-এর কোষে সঞ্চিত বীজবিন্দুর মুক্তি
আবারও 'ব্যক্ত' হতে পারে 'মৃত্তিকার প্রতিভা'।

'চম্পানগরের গণিকাদের মধ্যমণি' তরঙ্গিণী - 'সর্বকলায় বিদগ্ধ', 'রূপে, লা
ছলনায়' - অতুলনীয়া সে। রাজমন্ত্রীর মুখে বর্ণিত তরঙ্গিণীর এই অসামান
আভাসিত হয়েছে নাটকের সূচনালগ্নেই, যখন তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের নাম শুনে
'শতাধিক বারাঙ্গনা'র মতো 'সভয়ে শিউরে' উঠে ফিরে যায় নি সে, বরং আত্মপ্র
বলে উঠেছে - "পারবো, প্রভু আমি পারবো! আমার দেহ-মনে অপূর্ব
জেগেছে আমি সম্পূর্ণ দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।" বলা বাহুল্য
বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর এই প্রত্যয় জেগে উঠেছে রূপের উদ্ধত অহংকারেই।
নাগরিক মানসতায় ঋষ্যশৃঙ্গ জয় সেই রূপদর্প প্রকাশেরই সুবর্ণ সুযোগ, এক 'অ
অভিযান'এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু ব্যর্থ হয়নি তরঙ্গিণীর এই আত্মাভি
দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ মুহূর্তেই, তার দেহ রূপের প্রভাবে, 'ম
স্বরে' আর ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বিজিত হয়েছে তপস্বী। লাস্যময়ী তরঙ্গিণী তাকে দী
করেছে রতি-ক্রীড়ায়। ঋষ্যশৃঙ্গের মনের গুহায় যেন অনাদিকালের ঘুম ভেঙে
উঠেছে এক জন্তু, বুদ্ধদেব স্বয়ং যাকে বলেছেন 'ইন্দ্রিয়-লালসা'। মন্ত্রীর অ
মতোই 'কামনার রজ্জুতে বেঁধে তাকে রাজধানীতে নিয়ে এসেছে' তরঙ্গিণী। অঙ্গ
ফিরেছে সুদিন।

কিন্তু, কেবল তপস্বী নয়, আশ্চর্যের এই যে সে-মুহূর্তে বিজিত হয়েছে তরঙ্গি
দেবশিশুসমান, অপাপবিদ্ধ এই তপস্বীর বিস্ময়মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে সে
নিজেরই এক ভিন্ন মুখের প্রতিচ্ছায়া। " আপনি কোনো শাপভ্রষ্ট দেবতা? ন
আমারই কোনো অচেতন সুকৃতির ফলে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন? ...আপনি
জ্যোতিঃপুরুষ প্রতিভার দিব্যমূর্তি। .... সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন

...নল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার ...নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।" ঋষ্যশৃঙ্গের ...খ উচ্চারিত এই কথাগুলি তাই ভ্রমরের মধুগঞ্জনে ঘিরে রাখে তাকে, ...পজীবিনীর হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে চিরন্তনী এক নারী, এক প্রেমিকাকে। নাগরিক ...তায় ঋদ্ধ তরঙ্গিণী জানে যে, এতদিন ধরে যত প্রশংসা পেয়েছে সে তার সবই ...তার নামান্তর মাত্র, জীবনের নগ্ন প্রায়োজনিকতা থেকে উঠে আসা - কিন্তু এই ...র স্বরে নেই সেই ভোগলিপ্সার কুটিল মলিনতা, সৌন্দর্যের এ-বন্দনা নিরপেক্ষ ও ...সারিত। ঋষ্যশৃঙ্গের সেই দৃষ্টি' তাই তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এই আত্মজিজ্ঞাসায় ...জানি আমি কুরূপা নই, চম্পানগরে সুন্দরী বলে খ্যাতি আছে আমার - কিন্তু ...করে অন্য কেউ কেন বলে না? (ক্ষণকাল নীরব থেকে) কেমন করে ...ছিলেন আমার দিকে। যাকে দেখছিলেন সে কি আমি? (নিজের বাহু, উরু, ও ...দিকে তাকিয়ে) মা, সত্যি বলো, আমি কি অত সুন্দর?"

...শৃঙ্গের সংস্পর্শে এসে এতদিনে তরঙ্গিণী অনুভব করে যে, তারই আড়ালে জেগে ...এক মুখ, এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্য— যাকে পাওয়া যায় না 'ত্বক, মাংস, মেদ, কান্তি' ...শরীরের দেহগত বিশ্লেষণ, লুব্ধ চাটুকারিতায়। 'অধরা মাধুরী'তে গড়া সেই মুখ ...বিকৃত হতে পারে অন্য কারো চোখে। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাতে তাই ...ঘটল তরঙ্গিণীর, তার মধ্যে জেগে উঠল 'রোমান্টিক প্রেম'। যে প্রেমের ...বুদ্ধদেব নিজে জানিয়েছেন - " 'রোমান্টিক প্রেম' অর্থ হলো কোনো বিশেষ ...ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল, অবস্থানির্বিশেষ, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি— ...পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান, এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা"। নাটকে ...এই ভাবান্তরকে অসামান্য কুশলতায় ধরে দিয়েছেন নাট্যকার তপস্বী ও ...পারস্পরিক কথোপকথনে তাদের উপমা ব্যবহারের বিপ্রতীপতায়। ...বাসনা-মদিরতায় তরঙ্গিণী তাই তার 'ক্ষুধা' 'বাসনা' কিংবা 'প্রয়োজন'। ...ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর কাছে— তার 'হৃদয়ের রত্ন', 'প্রিয়', 'বন্ধু'। 'তাই ...- " এসো প্রেমিক, এসো দেবতা— আমাকে উদ্ধার কর"।

...প্রেমের আবেশেই অঙ্গদেশের ঋদ্ধি আর প্রাচুর্যের দিনেও অনন্ত তৃষ্ণা ...শৃঙ্গের রাজ্যে নিবাসিত থাকে তরঙ্গিণী। থাকে গৃহকোণে একাকিনী, সাড়া ...আহ্বানে। নাটকের সূচনায় অনেক গর্বে সে জানিয়েছিল যে 'বহুর ...' - " যে আমাকে মূল্য দেয় তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি - শূদ্র, ...রূপবান, কুৎসিত, আমার কাছে সকলেই সমান।" কারুর প্রতি

পক্ষপাত, পাপ তার কাছে। অথচ, বহুদিনের আচরিত এই ধর্ম থেকে স্খলিত হ
হয়ে ওঠে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি একনিষ্ঠ, একচারিণী। প্রেমের ধনে ধনী হয়ে সে
করতে পারে জাগতিক ঐশ্বর্যকে — "আমি একশত চন্দ্রকেতুকে বিলিয়ে দিতে
জগতে যত বামাক্ষী আছে তাদের মধ্যে।" মা লোলাপাঙ্গীর চোখে 'লোভের
উগ্র হয়ে ওঠে তার কাছে। চম্পানগরের প্রসিদ্ধ এই গণিকাকে 'স্বপ্নে জাগর
করতে থাকে তপস্বীর সেই দৃষ্টি- যে দৃষ্টির আলোয় ধরা পড়েছিল প্রসাধিত
আড়ালে তার অন্য এক মুখ, তার মৌলিকতা, অবিকারত্ব। নিরালায় বসে দর্প
খুঁজে ফেরে সেই মুখ - "বল, দর্পণ, সে কে? এক মুখ - একই মুখ ফুটে ওঠে বা
অন্য মুখ নেই? এসো বেরিয়ে এসো দর্পণের গভীর থেকে বেরিয়ে এসো আমা
মুখ।" অন্যদিকে, রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ সংবাদআক্রোশে
করে তাকে। তরঙ্গিনী ভাবে - "আমি, তরঙ্গিনী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম
আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না!" তরঙ্গিনীর এই ঔদ্ধত
এক বারাঙ্গনার রূপের ঔদ্ধত্য নয় আর, তার ভিত্তি আছে একনিষ্ঠ প্রেমিকার স্বা
অধিকারবোধে। বস্তুত, এ নাটকে জন্মান্তর বা রূপান্তর ঘটেছে তরঙ্গিণীরই।
কামের স্পর্শমণিতে তরঙ্গিণী হয়েছে সোনা। যে ছিল বারাঙ্গনা, সেই হতে
প্রেমিকা।

বিরহের এই অতল আর্তি নিয়ে আর আত্মজিজ্ঞাসায় দীর্ণ হতে হতে অবশেষে
এই নারীকে ফিরতে হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছেই। নিজেকে সে উদ্গত, সমর্পিত
দিতে চেয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে — "আজ আমি পাদ্য - অর্ঘ্য আনিনি, আনিনি
ছলনা, কোনো অভিসন্ধি — আজ আমি শুধু নিজেকে নিয়ে এসেছি, শুধু
সম্পূর্ণ, একান্ত আমি। প্রিয় আমার, আমাকে তুমি নন্দিত করো।" কিন্তু
নির্ধারিত হয়ে গেছে তপস্বীর পথ। মনস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ জেনেছে জীবনের এই সত্য
একটি নদীর একই জলে দুবার স্নান যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব প্রথম মিলনের
অভূতপূর্বতার আনন্দ দ্বিতীয়বার ফিরে পাওয়া। হতাশ হয়েছে তরঙ্গিণীও। ঋষ্য
যে দৃষ্টি ফিরে পেতে চেয়েছে সে, জেনেছে তা অপ্রাপ্য। সংসারের অভিজ্ঞতায়
গেছে তপস্বীর চোখের সেই বিস্ময়াবিষ্ট, অসংকোচ দৃষ্টি - "আমি স্বপ্নে দেখেছি
চোখ, জাগরণে দেখেছি সেই চোখ। আর এখন আমি তোমাকে দেখছি।
তোমাকে? সত্যি তোমাকে? কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তো
চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?" তবু থেমে যায় নি চলা। ভিন্ন
ঋষ্যশৃঙ্গের মতো তরঙ্গিণীও ডুবতে চেয়েছে শূন্যতায়, রিক্ততায়-এক রোমা
বিষাদে - "আমি কী হবো তা জানি না। আমার কী হবে তা জানি না। শুধু

কে যেতে হবে।" জাগতিক আলোর মোহিনী বলয় ছেড়ে তরঙ্গিণীর এই নিঃসঙ্গ আত্মশুদ্ধির অন্ধকারে — 'যে আঁধার আলোয় অধিক'।

-বন্দনা' তে বিধাতার উদ্দেশে উদাত্ত স্বরে জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব - "তুমি মোরে কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি সম, /তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা ___/... তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন/এই গর্ব মোর।..." তারুণ্যের এই আবেগদীপ্রতা ছেড়ে জীবনের অভিজ্ঞতায় তাকে জানতে হয়েছে যে, কামনার দহনক্রিয়ায় প্রেমের যে আলো বিচ্ছুরিত হয় - তাতেই পূর্ণতার নয়, প্রেমের সেই আলো সংবেদনশীল মানুষকে পথ দেখায় আত্মজিজ্ঞাসায়, সন্ধানে। জীবনের এই বোধ বা প্রজ্ঞারই প্রকাশ ঘটেছে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' তরঙ্গিণী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। পুরাণ এখানে সূত্র মাত্র, রবীন্দ্র-কবিতা কিন্তু সে-সমস্তকেই তিনি সাজিয়ে নিয়েছেন 'মনোমতো করে নতুনভাবে', সঞ্চার' করেছেন 'আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা'। তাই এ তপস্বী কিংবা তরঙ্গিণী যে 'পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে সমকালীন' সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। "The creative artist is, by definition one who refuses to conform to conventional whose aim it is to break up accept notions and something that he belives to contain more of truth y" ("Freedom of Culture" - Thought' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৪ই) — বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে অবশ্যমান্য এ-কথা।

Abul Fazl 'Allami' in Mughal India : His Thoughts & Writings

Dr. Jayashree Sarkar
Department of History

Abul Fazl was born in the year 1551 at Agra on14th January the second son of Sheikh Mubarak , a renowned scholar wit most liberal outlook who is thought to have a great influence Akbar Abul Fazl Allami was a great scholar whose wi ranging activities rendered him not only to become Mug Emperor Akbar's courtesan,advisor,MirBakshi (princ secretary),Waqiya Nigar (history writer),Diwan but a Akbar's spokesman and a key to his patron's intellect thinking.Satish Chandra thinks that as a leading historian of age, Abul Fazl set a style of prose- writing which was emula for many generations.

His elder brother was Abul Faiz Faizi ,a great liter personality in Persian and a court poet of Akbar. Abul F entered the imperial service in 1575. " Allami" refers to scholarly attributes. In the year 1591-1592, he received mansab of 2000 and was promoted to the rank of 2500 years later. He showed his military skill in Mughal campaign the Deccan. His tragic death in 1602 was a great blow to empire and mostly to the emperor whose end came th years later.

The greatest historical work on Timurids is undoubtedly A Fazl's Akbarnama, the
first text completed in 1596.This official history of Babur, Humayun and Akbar not only
used a large amount of archival material but also a numb of especially commissioned
memoirs of Gulbadan Begum's Humayun-Nama and Bay Bayat's Tazkira-i Humayun as well as other histo

narratives. As Athar Ali thinks, Abul Fazl had a much larger vision of history than mere annals, and he therefore appended to his narrative history, what came to be considered a separate work, the Ain- i Akbari containing massive fiscal, financial and social data, a detailed provincial gazetteer and a cultural history of India. It is remarkable in being without any religious bias and in treating Indian culture as a composite one to which both Hindu and Muslim traditions have contributed . There is no better illustration than the style in which Akbar's councilor Abul Fazl prepared the history of the Mughal dynasty, but principally of Akbar's reign. Its third volume consisting of Ain-i Akbari, treated as a separate work, was to deal with Akbar's administration, empire, culture and cultural history of India. He was directed by Akbar to prepare such a history in 1589;the work came to a close in 1596 and then continuing to work on Ain-i Akbari till 1599 and carrying on the Akbarnama narrative to 1600.Abul Fazl in his preface to Akbarnama speaks of the large amount of archival and documentary material used by him. Akbar had established his system of waqai or news reporting and recording in1574. From that time Abul Fazl had access to a vast, rigourously chronological recorded events at court itself. He also collected texts of all the orders which Akbar had issued since his accession. The Ain- i Akbari containing full texts of such documents as Todar Mal's memorandum on revenue administration and Akbar's orders thereon (1582), Sharif Sarmadi's report on Man Singh's campaign in Orissa(1590), and Prince Murad's queries and Akbar's replies on administrative and other matters (1591).Athar Ali holds that the archival base is very strong in Ain- i Akbari whose provincial and local statistics, revenue and financial data information regarding regulations of different departments, rates of prices and wages drawn from a large number of official sources and collected as well as screened by a veritable secretariat. Abul Fazl, ofcourse , emphasizes in his conclusion a problem he faced with a multiplicity of sources he has to confront and resolve. His Rokayat-i Abul Fazl is a collection of forty-six letters and some of the persons to whom they were addressed

were Abdulla Khan, Daniyal, Akbar,Mariam Makani, She
Mubarak,Faizi.Written in three volumes, Muqtibat-i Alla
contains a bunch of letters written by Fazl at the direction
Akbar to the rulers of Iran and Turan,a few Badshahi Farma
Abul Fazl's personal letters to his friends and relatives. H
critiques on ancient narrative writers were also included. Iqb

Ghani Khan in his essay "Scientific Concepts In Abul Faz
Ain-i Akbari" justly brings out an interesting European a
indigenous account of Akbar's inquisitiveness that he had
passing interest in science and technology. H
spokesman,Abul Fazl devotes several sections to thin
scientific and technological in his Ain-i Akbari.Athar Ali is
opinion that information about the Europeans was available
Akbar and his contemporaries. Abul Fazl was aware that t
Europeans had discovered "America" which he called 'Al
Nau' – the New World. The accounts of the time are repl
with references to the technological ingenuity of the 'Firang
The lead that Europe was attaining in several branches
human activity could not but engender questioning about t
finality of traditional knowledge .The rational approach of A
Fazl had put him to point out that zinc as a separate meta
recent discovery in Asia) was not known to the ancients (A
iAkbari,I, p.24).

M.Athar Ali is of opinion that in the chapter, Rawat-i rozi in t
Ain-i Akbari, Abul Fazl repeats the well-known theory of soc
contract to justify the sovereign's absolute claims over t
individual subject. The emperor enjoyed the position
spiritual guide and that this position is derived from the no
that "Sovereignty is a ray of light from the Divine Sun'(A
Akbari, Vol.III).As such, men of all faith were beneficiaries
the Divine Light. In his The Mughal Empire, John F. Richa
too thinks, in the Fatehpur Sikri years, Abul Fazl's breadth
vision and political activity brought him to prominence as t
leading Timurid ideologue and propagandist. In his n
capacity,Akbar's intellectual began to erect scaffolding fo

Timurid dynastic ideology – an edifice aimed at establishing a new legitimacy for Akbar and his successors. Despite all his cruelties and massacres, the greatest legacy of Timur was upholding and strengthening of the concept of the 'state' as a liberal and civilizing institution. This Timurid tradition had been maintained and carried to India by his descendants. In discussions at court, in a wide-ranging official and private correspondence, and in eulogistic poetry,Abul Fazl and Faizi began to assert Akbar's divinely illuminated right to rule.The most systematic expression of this doctrine is found in Akbar-Nama,the annual recounting of events of forty-seven years of Akbar's reign with Ain-i Akbari appended as a manual. At the core of his work, permeating every passage,Abul Fazl embodied ultimate legitimacy for Akbar.Akbar-Nama portrays Akbar as a superior being, recipient of Hidden Light, whose ineffable radiance was perceptible to superior man. He refused to concern himself with the theory of legitimizing the petty military dictators who forcibly seized power and automatically legitimizing their position .His Padshah (king) or Shahenshah (king of kings) was a unique personality; he was the "perfect man". Abul Fazl was inspired by the need to rationalize the broadly-based policies of peace and concord with all religious communities initiated by his patron, Akbar. Satish Chandra through his evaluation of Abul Fazl brings out Fazl's deep understanding of Akbar.To him , it was necessary for a king to establish social stability by not permeating the dust of sectarian strife to arise. Despite his strong belief in hierarchy, Fazl was concerned with the need of absorbing into imperial service men of talent, irrespective of their social background. Abul Fazl's basic concept was of a liberal absolutism under a ruler of high endeavor endowed with highest moral and spiritual qualities and enjoying Heaven's Mandate so that he was not dependent on any set of religious leaders for legitimization. There can be little doubt, that the type of secularist, poly-religious state based on a composite ruling class drawn from different ethnic and religious groups, hierarchical in nature and humane in dealing with the masses irrespective of birth, religion or status

was an ideal far in advance of anything postulated or practice
in Asia or in Europe at that time. To him, even Akbar
conquests were not based on a spirit of aggrandizement, b
was part of a larger plan to establish an all-India polity base
on justice and tolerance which could rightly be termed as "da
ul-sulh". For sovereign "is Father to Humanity.All kinds
people seek comfort from him."(Ain-i Akbari, III) He was th
principal debater in the Ibadatkhana (House of Worshippe
in Fatehpur Sikri.He had been trained by his father, Shai
Mubarak. The prominent ulema at the court such as Ibrah
Sirhindi, Makhdum-ul Mulk and Shaikh Abdun Nabi were h
target of attack.The word used by Abul Fazl for Akbar's ne
path of belief, Din-i Ilahi (Divine Faith) was Tauhid-i Ilahi(Divi
Monotheism) which was really an order of Sufistic type. Ab
Fazl thought that it was natural for people to turn to their rul
for spiritual guidance and that Akbar was well qualified to lea
the people to spiritual bliss and to establish harmony amo
warring creeds.

Akbar condemned the pusillanimity of men of 'Hindostan' wh
allowed or encouraged'Sati' by their women.(Akbar Nama,
version, British Library).A stronger condemnation of me
behaviour by Akbar is quoted by Abul Fazl among the 'sayin
of Akbar' towards the end of Ain-i Akbari. Akbar thus adds
new compound to the vision of India, that of reform -h
prohibition of sati, pre-puberty marriages, his demand f
equal inheritance for the daughter, and of soci
equalities.Referring to the Indian custom of preventing
woman in seeing her future husband, before marriage,Ab
Fazl says that Akbar ruled that the consent of the brid
bridegroom and the parents were absolutely necessary
marriage contracts.The Mughal Regulations crystalliz
under Akbar and became law and served as guiding principl
in military, civil and judicial departments in their dealings wi
people of a.multi racial and religious empire. The laws a
epitomized in the voluminous Ain - i Akbari.

Akbar compiled a code of education regulations, suggesting dramatic innovations in both teaching methods and syllabi from elementary to the highest stage – every student should read books on morals, arithmetic, agriculture, measurement, geometry, astronomy, physiognomy, household matters, the rules of government, medicine, logic,mathematical and religious sciences and history. But Abul Fazl claims that though these regulations shed a new light, they failed to create any interest among the ulema who managed the educational institutions. He advised the nobles to study the works of Al-Ghazali and other historical and ethico-political works.

Akbar's translations bureau the Maktab Khana's most remarkable production s were the translations of the Mahabharata, the Ramayana and the Yoga Vashistha.Abul Fazl wrote the Preface to the Mahabharata. Discussing Akbar's motives for ordering the translations, he claimed that the emperor sought to heal the religious differences among his subjects. Reliably translated texts from both religions would form a basis for a united search for truth. Abul Fazl continually censured the ignorance and shortsightedness of his contemporaries. The Ain-i Akbari includes some discussions on contemporary Hindu and Jain philosophy. He was well versed in the Arabic translation of Chanakyaniti and the Sanskrit works of ancient Indian polity.

Suchi Chandra, a Jain scholar of Sanskrit and Persian in Mughal court writes about Aqbul Fazl that he was endowed with eight qualities of intellect: desiring to hear, inquiring again, learning, understanding, reflecting, removing doubts by the exercise of reasoning, fixing a thing in mind and putting it into practice. He had mastery over various schools of philosophy, Jainism, Mimansa, Buddhism, Sankhya Vaiseshika, Charvaka, Jaiminiya, Patanjali, Yoga Vedanta, vocabulary and lexicography, music, dramaturgy, rhetoric, prosody, astrology, politics, mathematics, palmistry, veterinary sciences and such others. In appreciation of his service, the emperor conferred on

him the title 'Dalathambhan'(Pillar of the Army).
Thus to Abul Fazl,Akbar's leadership ensured the loyalty to
Mughal throne of the heterogeneous religious and
groups of the country and awakened them to the importa
co-existence, cooperation and toleration. He justifies Ak
his dream and construction of a "Hindostan" that could
out in the world.

References:

M. Athar Ali, 'The Perception of India in Akbar and Abul Fa
Irfan Habib (ed.),Akbar And His India, New Delhi, 2005.

Iqbal Ghani Khan, "Scientific Concepts in Abul Fazl's
Akbari" ,ibid.

S.A.A. Rizvi, The Wonder That Was India ,Part II, New D
1999.
Satish Chandra, History of Medieval India, New Delhi, 20
John F. Richards, The Mughal Empire, New Delhi, 1998.
Irfan Habib, Medieval India:The Study of a Civilization,
Delhi, 2008.

Rahul Sankrityan, Akbar (translated from Hindi to Beng
Ashraf Choudhury),Kolkata, 2011.

Siddhi Chandra, 'Bhanu Chandra Charitra' in Mohan Lal
Chandra (ed.),Jain Series , No.15,Calcutta, 1941.

Money, Marriage and Jane Austen

Soma Mandal
Department of English

In Gabriel Garcia Marquez's novel 'Love in the Time of Cholera' the intellectual poetess Sara Noriega describes Fermina Daza, the heroine of the novel, as a whore. "By virtue of marrying a man she does not love for money" she argues, "That's the lowest kind of whore." Most of Jane Austen's female characters in her six novels encounter this moral dilemma: choice of a husband and the prospect of economic security . On the one hand stand the characters like Charlotte in Pride and Prejudice, Isabella in Northanger Abbey, Harriet in Emma, for whom the choice of economic security prioritises over the choice of their emotional partner; on the other hand characters like Elizabeth in Pride and Prejudice , Anne in Persuasion, Fanny in Mansfield Park refuse to compromise their individuality for economic prospect. In this paper I intend to discuss how the marital choice of an Austen character is determined by the social aspect in which one is situated and how that posits Jane Austen in the centre of feminist discourse.

In his book 'The Origin of the Family, Private Property and the State' Friedrich Engels writes on the functional division of labour between male and female. Women's role at the centre of the communistic household changed when human society settled in one place from their nomadic existence. Gradually 'production' became essentially a male activity. According to Engels entering in the productive role of the society was very crucial for the emancipation of the women. In eighteenth century England the role of women was specifically centred in the household activities; 'female accomplishment' defined by the society was predominantly the works of singing, sewing, dancing, painting. In Jane Austen's time young

women of the 'genteel' classes found little opportunities to
economically independent as they had no access to
universities or any other recognized professions. In
Mary Wollstonecraft published her seminal work 'Vindica
of the Rights of Woman' invoking the rights of women in a
that questioned the established patriarchal norms of
society and proposed 'to see women as the rational equa
men' .The awareness of social vulnerability of women s
they do not have financial autonomy has been one of
agenda proposed by the feminist discourse.

Margaret Kirkham in her book 'Jane Austen, Feminism a
Fiction' observes that the novels written by Jane Austen a
'the culmination of a line of development in thought and fic
which goes back to the start of the eighteenth century, a
which deserve to be called 'feminist' since it was concer
with establishing the moral equality of men and women a
the proper status of individual women as accounta
beings'.Wollstonecraft who is concerned with the middle cla
women and their marital status observes that women need
bring other qualities besides beauty or sensibility a
associates lack of a proper education with wome
exploitation of the marriage market. In a letter addressed
Fanny, on 13th March, 1816 Austen said that 'Single wom
have a dreadful propensity for being poor, which is one ve
strong argument in favour of matrimony.' The domestic loca
of her novel not only provides the scope to envisage th
financial status of a woman in the society but also focuses o
her precarious situation when she is denied the economi
security.

The most obvious threat to the apparently peaceful existence
of an unmarried woman was the question of entailment – a
particular problem dealt by Austen alongside the romantic plo
of her most popular novel Pride and Prejudice. Only the male

They can lawfully gain the ownership of a real estate. As Mr Bennett has no sons his property will be entailed to Mr Collins , the distant male heir. It is this social system of entailment that determines the marital choice of a woman – with five daughters and no sons Mrs Bennett feels desperate to choose prosperous groom to get her daughters married off in order to secure their future. She shares her concern with her husband: 'I never can be thankful, Mr Bennet, for any thing about the entail. How anyone could have the conscience to entail away an estate from one's own daughters I cannot understand;...' She feels elated when Jane, her eldest daughter draws the attention of 'rich' Mr Bingley –' a single man of large fortune , four or five thousand a year' (pg 5) Elizabeth's refusal to accept the proposal of Mr Collins makes her only miserable , she tries her best to make Elizabeth marry Collins by coaxing and threatening her by turns : 'But I tell you what, Miss Lizzy, if you take it into your head to go on refusing every offer of marriage in this way, you will never get a husband at all – and I am sure I do not know who is to maintain you when your father is dead.- ...'(pg 110);the question of maintenance on the part of the women thus determines their choice of husband. This view finds its most cynical expression in the opinion of Charlotte whose acceptance of Mr Collins as her marital partner is absolutely based on her awareness of her own vulnerable situation: 'I am not romantic you know. I never was. I ask only a comfortable home; and considering Mr Collins's character, connections and situation in life, I am convinced that my chance of happiness with him is as fair, as most people can boast on entering the marriage state .'(pg 123) .

In 'Northanger Abbey' Isabella Thorp desperately searches for a rich husband- she is able to secure James Morland but later chooses rich Frederick Tilney for his great estate. In 'The Watsons' Elizabeth shares the same view when she tells Emma that 'I should not like marrying a disagreeable man any more than yourself, – but I do not think there *are* many

disagreeable men; -- I think I could like any good-humou
man with a comfortable income.

In her much later work 'Persuasion' the question of inherita
plays an important role in the development of ma
relationship: Elliot daughters know that their father's esta
going to be inherited by their cousin , William Walter Elliot. E
Thus Elizabeth, Sir Walter's eldest daughter, realizes at a
early age that she needs to marry her cousin in order to sec
the family fortune: 'She had , while a very young girl, as s
as she had known him to be , in the event of her having
brother, the future baronet, meant to marry him; and her fa
had always meant that she should.'(pg7- 8) .Anne Elliot
persuaded to refuse Mr Wentworth on the ground that he
neither title nor estate , but later suffers when she finds how
has lost the prospect of happiness as Mr Wentworth retu
after his subsequent success securing his place in the N
Lists.

In spite of the question of security as a motivating force be
marriage there are women who refuse to accept the propos
from men they do not love or admire. Emma in 'The Wats
says that "To be so bent on marriage -- to pursue a man me
for the sake of a situation -- is a sort of thing that shocks m
cannot understand it. Poverty is a great evil, but to a woma
education and feeling it ought not, it cannot be the greates
would rather be a teacher in a school (and I can think of no
worse) than marry a man I did not like." In 'Pride and Preju
Elizabeth Bennet , not only defies the norms laid down by
society but also shows her integrity as an individual. After
unwelcome proposal from Mr Collins, Elizabeth asserts
'right to autonomous choice' : I thank you again and agai
the honour you have done me in your proposals, but to acc
them is absolutely impossible . My feelings in every res
forbid it...Do not consider me now as an elegant fe
intending to plague you, but as a rational creature speaking

from her heart.' Her mother tries hard to bring her to reason' and Mr Collins easily comes to the conclusion that 'If therefore she actually persists in rejecting my suit, perhaps it were better'

not to force her into accepting me, because if liable to such defects of temper , she could not contribute much to my felicity.' Mr Collins can explain the cause of her refusal as 'defects of temper', but Elizabeth actually speaks in Wollstonecraftian term asserting her 'right to autonomous choice' . While proposing to Elizabeth Mr Darcy specifically mentions her inferior connections and how that prevented him the acknowledgement of his regard: ' He spoke well, but there were feelings besides those of the heart to be detailed, and he was not more eloquent on the subject of tenderness than of pride. His sense of inferiority- of its being a degradation- of the family obstacles which judgement had always opposed to inclination, were dwelt on with a warmth which seemed due to the consequence he was wounding, but was very unlikely to recommend his suit.' Elizabeth refuses him making herself very clear regarding her deep sense of mortification and also specifically points out his arrogant behaviour : "You are mistaken, Mr Darcy, if you suppose that the mode of your declaration affected me in any other way, than as it spared me the concern which I might have felt in refusing you' had you behaved in a more gentleman-like manner." (Pg 188)

However, in her all novels we find the women characters are rewarded and the heroines are able to grasp some means of ' self preservation' even though they undergo suffering in order to be true to their moral principles. All her novels end with a happy reconciliation between the hero and the heroine -Elizabeth, Fanny, Anne are able to 'secure' their fortune by marrying the respective man of their choice. But being a spinster and once refusing the marriage proposal from a person Austen herself had to suffer as she had little financial

support from the family. In her own life Austen experienced the hardship because of precarious economic state caused by the death of her father. Mrs Austen and her two daughters Cassandra and Jane were left without pension to live on their own. Her brothers offered what they could to the three women but that did not do much help. Later Edward, one of her brothers, provided a home for them at Chawton but in her later years she was left helpless with no income and no choices. Yet Austen was true to her emotions- she had expressed her thoughts about marriage as a 'compact of convenience', years later advising her niece Fanny, Austen wrote , 'Anything is to be preferred or endured than marrying without affection.'

Reference:

Jane Austen, Feminism and Fiction- Margaret Kirkham , Short Run Press Ltd, Exeter, 1997

A Companion to Jane Austen edited by Claudia L. Johnson and Clara Tuite Wiley-Blackwell

Pride and Prejudice – Jane Austen , Penguin Classics 2003

Jane Austen: Carol Shields , Weidenfeld and Nicolson , London

Love in the Time of Cholera-Gabriel Garcia Marquez, Penguin Books India 1989.

Sylvia Plath's Delineation of Motherhood

Dr. (Ms.) Lopamudra Das
Associate Professor, APC College, New Barrackpore

Motherhood is one of the highly contested sites for feminists. For some, reproduction and mothering are oppressive and so must be lifted. However, for others, motherhood is one of the greatest pleasures of being a woman. The second group is of the view that woman's power is reinforced by woman's reproductive capabilities. The objective of this essay is to focus on the issue that motherhood in Sylvia Plath's created world should be seen as a plurality.

Simone de Beauvoir's The Second Sex was published in 1949. It followed de Beauvoir deliberately distancing herself, both in her life (she never had children) and in her thought, from motherhood. For Adrienne Rich, more or less Sylvia Plath's contemporary, poetry can only be written by the part of the self that is no mother. [1]

Sylvia Plath too demonstrates the Beauvoirian identification of maternal functions with domestic confinement. But the interesting feature of Plath's writings is that there is a decisive shift from de Beauvoir's denunciation of motherhood. Plath takes the opportunity of focusing on motherhood in such a way that there is an empowering affirmation. In a letter dated April 1960 she states: "The whole experience of birth and baby seems much deeper, much closer to the bone, than love and marriage...Frieda is my answer to the Hydrogen-bomb." (Letters Home, pp 378-79)

The idea of maternal writing is troublesome, because motherhood and authorhood have been projected as mutually exclusive. 'Mother' and 'writer' seem to be antagonistic.

Plath's writings demonstrate this pressure, but she does n
succumb to that. She seems to echo what Sapho wrote to h
daughter Cleis :

> There is no place for grief, [Cleis]
> In a house which serves the Muse;
> Our own is no exception.

In this household everyone is entitled "to joy, to love, to mak
poetry. The mother sings to her daughter." [2]

Plath explores first the established constructs of the mate
body, she utilizes the concept of confinement. One entry
her The Unabridged Journals (p. 172) show the sh
physical and emotional absorption that motherho
demands: "..... Motherhood means being insta
interruptible, responsive, responsible. Children need o
now .....It is distraction, not meditation that becom
habitual; interruption not continuity; spasmodic, not consta
toil ...." [3] Again, Esther, in the novel, The Bell Jar declares
I had to wait on a baby all day, I would go mad." (p.25
'Morning Song' is generally interpreted as a poem which
resonant with the ecstasy of motherhood. However, the poe
has a sub-text. Though the baby is helpless, yet it poses to
a threat. The heralding of the birth of a child is associated w
the mother's perceived obliteration as an individual. The s
sacrificing and nurturing role epitomized in motherhood is t
socially prescribed one for women. In the process the wom
misses her own identity. So, in the poem, the mother perso
utters "One cry and I stumble from bed, cow-heavy and flor
In my Victorian nightgown." (LL. 13-14). The disgust s
expresses with "cow-heavy" is reiterated in the poe
'Metaphor'. The distaste for the disfigured pregnant st
comes out when a mother's body becomes "an elephan
ponderous house..."

In stark contrast to the above references, Plath's writi

abound with examples which suggest the exuberance and thrill of motherhood. The simplicity of such lines as "I hold you on my arm" ('By Candlelight') or "What is so real as the cry of a child?' ('Kindness') create a maternal tenderness which do not consider the obligations of motherhood as self- depleting.

The relationship of the mother and child starts with the mother's meticulous effort: "I made it myself, cell by cell from a quiet corner." ('Poem for a Birthday, 2'). There is a time when mother's identity is reflected in the child : "I look in/and find no face but my own...." ('For a Fatherless Son'). But this situation changes. The third stanza of 'Morning Song' draws attention to the autonomy of existence of the child : "I'm no more your mother..."

Society works from yet another level. "How long can I be a wall, keeping the wind off? / How long can I be / Gentling the sun with the shade of my hand ... / How long can my hands/ Be a bandage to his hurt ..." ('Three Women'). Imminence of the hostile world is resonant.

Motherhood, in its daunting complexity is depicted by Plath. The mother persona at times desperately wants to move out of the orbit of maternal obligations because they frighteningly eclipse her identity. But at the same time she expresses her concern over yielding her child to the inimical external world. She yet again has the agonized realization that "the fluid in which we meet each other" ('By Candlelight') is fast waning.

But Plath's delineation of motherhood is even more ambivalent. In 'Childless Woman' the declaration by the mother persona that she is spinning like a spider an exact image "loyal" to herself, is very disturbing. In the web woven, the child is caught and can hardly breathe. The devouring nature of the relationship is disturbingly alluded to in "O high-riser, my little loaf" ('You're') or "This loaf's big with yeasty rising" ('Metaphor').

Once after hearing from her daughter having a "special" date Mrs. Aurelia Plath exclaimed : "ah, then she'd picture the evening for me, and I'd taste her enjoyment as if it were my own." [4]. This intensity of relating one's "hunger" to the hunger of the child haunts the reader.

The figure of a mother is very intriguing perhaps because of the multiplicity of woman is nowhere more obvious than in this figure. Marianne Hirsch is quite right when she observes that a mother is "both mother and daughter". [5] There is a constant oscillation in her status. When her discourse is voiced, she is the subject; and when she is represented she is controlled by her object status.

The precocious individuation in Plath is in fact initiated by her mother. In a 1962 composition "Ocean 1212 – W", Plath's response to the birth of her sibling Warren is as follows:

As from a star I saw, coldly and soberly, the separateness of everything.

I felt the wall of my skin : I am I .....
My beautiful fusion with the things of this world was over.

Thus, the first 'lack' that a child encounters is the mother. The concept of otherness starts from here. Critics have time and again emphasized how Plath has expressed the void created by her father's absence. But one should not under-estimate the obsession in Plath with 'lacking' centered around the mother-figure.

Though there is desperation in Sylvia to break away from the tenderness of the mother, yet it is the lack of this tenderness that haunts her. Esther loves Dr. Nolan, the reason is she "hugged me like a mother." (The Bell Jar, p.238). In Letter Home (p. 217), she expresses her longing to be "babied". Again, when Constantine coaxingly touches Esther's hair, he

response is significant. "..... Ever since I was small, I loved feeling somebody comb my hair. It made me go all sleepy and peaceful." (The Bell Jar, p. 70)

The same writer who can create such moments of yearnings for maternal gestures, surprises us when she expresses harrowing sense of death – wish for her mother, Esther's oft-quoted description of her sleeping mother in The Bell Jar is a case in point where there is a ventilation of the rage :

My mother turned from a foggy log into a slumbering middle-aged woman, her mouth slightly open and a snore raveling from her throat. The piggish noise irritated me, and for a while it seemed to me that the only way to stop it would be to take the column of skin and sinew from which it rose and twist it to silence between my hands. (pp. 137-38)

The same venom is there in the short story "Tongues of Stone", where the daughter wants to "twist the life out of the fragile throat" of her mother. [6] Sylvia's expression of hatred of mother was perhaps a product of "the feminist enlightenment of the 50's and 60's" as Elaine Showalter would put it. Sylvia's delineation seems to reflect that this hatred for the mother goes much beyond matrophobia to "a courageously sustained quest for the mother"

The mother both biological and cultural.

In the first example, mention has been made of "silence" and in the latter of "the fragile throat". These create an association with the production of sound and hence symbolically with language itself. Language is thus the field from where maternal representation is erased off. Hostility towards the mother figure is repeated. In the poem 'Medusa', the daughter's rejection of the food and also the source of the food is echoed in "I shall take no bite of your body." In the same poem "Off, off, eely tentacle!" voices the struggle against the claim of the mother.

When a girl reaches adolescence, she starts with her strug
to separate from her mother. However, there is
simultaneous feeling in the daughter of the close bond with
mother. This is how Nancy Chodorow tries to explain
mother daughter conflict. She furthers her argument
saying that mothers "desire both to keep their daughter cl
and to push them to adulthood." This makes the daug
anxious and provokes attempts by their daughters to br
away.[8] Thus, Plath's attempts to break free from
"smarmy matriarchy of togetherness" [9]can be
explained by Chodorow's theory rather than merely ca
Plath an ungrateful daughter.

There is an eternal drama of symbiosis and individua
between the mother and daughter. However, there
moments suggestive of the inexorability of the maternal g
and the futility associated with the whole process of strug
thus chiseling the drama: "Did I escape, I wonder?" ('Medu
Emphatic dissolution of the relationship in "There is not
between us" ('Medusa') does not rob it off the ambig
suggested by the word "nothing".

Apart from this psychological approach to the relations
there is a social interpretation of this relationship. A
influential writing of the fourth decade of the twentieth cen
was Philip Wylie's Generation of Vipers (1943). It was
work which gave currency to the word "Momism". Wylie in
pointed out that the whole reason behind the decline
American social culture was the dominating mother, resu
in emasculation. The poem 'The Babysitters' shows
Plath was aware of this book. The Medusan concept
been derived from "cold war materialism". Women's role
to produce "useful, well adjusted citizens". So homes
places of stereotyped productions. Thus, mothers bec
the agents involved in building up utilitarian citizens. [10]
the child tries to come out of the ideal world created by
worm", "fireflies", "twinkle – dress", "ginger-bread", "co

and ovaltine", "bubbles". The endeavour on the part of the child is to learn from "muses unhired by you, dear mother." ('The Disquieting Muses')

The whole of Plathean creation is replete with the direct or indirect reference to breasts. There is an interesting account of how Aurelia's breast became Plath's focus with the birth of Warren, her brother. This is the anxiety of separation. The sense of the self as the centre of the loved objects world is challenged. A letter of Aurelia projects a new aspect of nourishment all together. She refers to Sylvia's discovery of alphabets at the time when Aurelia was more engrossed with Warren : "With great rapidity she learned the names of the letters and I taught her the separate sounds of each ...." [11]. This situation of Plath, learning to read, can be best understood if one goes through one of Melanie Klein's case studies. It involved a two year old girl who refused to speak and was completely impassive in her relations to others. Klein suggested that the child needed to be separated from her mother, in order to "activate anxiety". Klein's association of separation anxiety with linguistic ability clearly explains Plath's situation. The child Plath starts aligning with the alphabets – the symbolic representations at the moment when her mother is unable to establish a bond with her through her "breasts". Thus, the child's separation from the mother signals its entrance into the symbolic order.

Thus, in Plath's writings oral dependence of a child on a mother moves far from mere nourishment; it is a kind of intellectual bonding. "Mother, you are the one mouth/ I would be a tongue to. Mother of otherness/ Eat me." ('Who', poem 1 of 'Poem for a Birthday'). Here she talks about the replication of the language of the mother.

One correspondence with Warren is important in the analysis of the mother – child drama that Plath's created oeuvre unfolds:

You know, as I do, and it is a frightening thing, that mother co actually kill herself for us. She is abnormally altruistic pers and I have realized lately that we have to fight her selflessn as we would fight against a deadly disease. (p. 112).

Instead of enjoying mother's 'selflessness' Plath is ove critical of the socially prescribed role that a mother associated with. This process to break out of moth bondage is perhaps generated by looking at mothers victims, as unfree women. This perhaps can be best explai by Adrienne Rich's concept of the 'martyr' mothers.

Nancy Friday's book My Mother/My Self subtitled A Daught Search for Identity begins with a chapter titled "Mother Love" which the first two sentences are "I have always lied to mother. And she to me." The other one is- "when I stopp seeing my mother with the eyes of a child, I saw the wom who helped me give birth to myself." [12] Sylvia Pla depiction of the mother-daughter relation is encoded in the two sentences. She shows how a mother, necessitated by t myth of maternal love represses herself. This in turn create heritage of self-rejection, duplicity and anger. The figure Mother thus becomes an important object of exploration Plath's writings. This process is both exhilarating a terrifying.
This mother-daughter dyad thus proves that the story of t development of a woman needs to be written in the voices mothers as well as daughter: 'Only in combining both voices, finding a double voice that would yield a multiple femini consciousness, can we begin to envision ways to 'live afres [13]

There is a constant effort of constructing subjectivity over t desired as well as feared maternal body, which can never b fully repressed. The female body becomes the emblem of t most agonizing ambivalence of subjectivity. This is in contra to a hierarchical structure patronized by patriarchy – where t

relation is defined between subject and object. Jessica Benjamin's words perhaps offer the best interpretation of this mother-daughter symbiosis which Plath has developed:

Woman's desire ... can be found not through the current emphasis on freedom from : as autonomy or separation from a powerful other guaranteed by identification with an opposing power. Rather we are seeking a relationship to desire in the freedom to. Freedom to be both with and distinct from the other. This relationship can be grasped in terms of intersubjective reality, where subject meets subject. [14]

End Notes:

Sylvia Plath's poems were drawn from her The Collected Poems edited by Ted Hughes, London: Faber and Faber, 1981

Reference:

1. Rich Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: W.W. Norton, 1976
2. Jouve, Nicole Ward, "No One's Mother: Can The Mother Write Poetry?" Vicki Bertram(ed) Kicking Daffodils, Edinburgh University Press,1997, p. 278
3. Plath Sylvia. The Unabridged Journals of Sylvia Plath 1950-1962, Karen V. Kukil (ed). New York Anchor Books, p.172
4. Letters Home, : Correspondence 1950-1963, (ed.) Aurelia Plath. New York Harper & Row, 1975,p.38
5. The Mother/Daughter Plot: Narrative Psychoanalysis Feminism. Bloomington: Edinburgh University Press,1989,p.12
6. Johnny Panic and the Bible of Dreams, Short Stories, Prose and Diary Excerpts. New York: Harper & Row, 1979, p.265

7. Showalter, Elaine. "Feminist Criticism in Wilderness"

8. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and t Sociology on Gender. Berkley: University of Califo Press, 1978, p.135

9. The Journals of Sylvia Plath (ed) Ted Hughes a Frances McCullough, New York: Dial 1982, p.429

10. Paul, Alexander (ed) Ariel Ascending, New York: Har &Row, 1985,pp.215-16

11. Letters Home p.16

12. Johnson, Barbara. A World of Difference, Baltim Johns Hopkins University Press 1987, p.147

13. Hirsch, Marianne, The Mother/Daughter Plot: Narrat Psychoanalysis, Feminism. Bloomington: Edinbu University Press, 1989, p.161

14. Benjamin, Jessica. 'A Desire of One's O Psychoanalytic Feminism and Inter subjective Spa Teresa de Lauertis (ed) Feminist Studies/Crit Studies. Bloomington: Indian University Press, 19 p.83

সাহিত্যে পারাপার ঃ প্রসঙ্গ জীবনানন্দ

সুপ্রিয় ধর
অতিথি অধ্যাপক, ইংরাজী সাহিত্য বিভাগ

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে, তা সে কথা সাহিত্যই হোক বা কবিতাই হোক, বিষয়বস্তু ভাব ও ভঙ্গির নিরন্তর পারাপার লেখক ও কবিদের মধ্যে সর্বদাই দৃষ্ট হয়। 'The suicide Club' গল্পটি কে আগে লিখেছিলেন মোপাসা না রবার্ট লুই স্টিভেনসন এই প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিতই থেকে গেছে। বিপরীত উদাহরণও আছে। জেমস জয়েস্ -এর 'The Dead' আর ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড এর 'The Stranger'এর বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষণীয় কিন্তু দুটিকে সম্পূর্ন মৌলিক বলে স্বীকার করে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এমন রচনাও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতীয়মান হয় যার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে কিছুই মিল নেই, কিন্তু বিশ্বজাগতিক মানবজীবনে কোথাও যে একটা সুগভীর ঐক্য আছে তা দেশ কালের গণ্ডি অতিক্রম করে লেখকদের রচনায় দৃষ্টান্তিত হয়ে আছে।

'নিকটের পাহাড়ের বন-তুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে' – (ক্ষুধিত পাষাণ) রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে 'বহু দিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধে'— এরকম শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসে আমাদের চেতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে জীবনানন্দ দাশের 'লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ', 'চালের ধূসর গন্ধ'। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মায়াবী জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন জীবনানন্দেরও অনেক আগে, কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই গল্পের সাম্রাজ্যকে আবিষ্কার করে পুলকিত হই। এই দুই লেখকের মধ্যে আর কোনও বিষয়েই কোন মিল নেই, কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য যোগ সূত্রিতায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুষঙ্গের উত্তরাধিকারী জীবনানন্দ।

টলস্টয়ের উপন্যাসে তৎকালীন রাশিয়ার সামন্ততন্ত্রের শোষণ বীভৎসতা ও নিপীড়নের নিখুঁত দলিল আমরা লক্ষ্ণ করি অপরদিকে পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলার গ্রামীন জমিদারতন্ত্রের যাবতীয় অন্ধকার দিকগুলি শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোট গল্পে মূর্ত হতে দেখি। পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই লেখক, ভাষাগত ও জাতিগতভাবে তারা দুই মেরুর বাসিন্দা। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এধরণের গল্প উপন্যাসে টলস্টয়ের প্রলম্বিত ছায়া দীর্ঘ থেকে অনুভূত হয়। কি করে সম্ভব হল? এ প্রশ্ন অবান্তর, কেননা লেখকের মননে এ ধরনের

পারাপার চলতেই থাকে — তা সে সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোক না কে
দুজন লেখকের মধ্যে সাদৃশ্য এইটুকুই। টলস্টয় মনে প্রাণে সামন্ততন্ত্রের সমর্থক হ
সত্বেও এই ব্যবস্থাটি যে অবক্ষয়ী এবং তার পতন যে অশ্যম্ভাবী এই ঐতিহাসিক বা
দিতে ভোলেননি। এই কারণেই লেনিন টলস্টয় সম্পর্কে সুগভীর শ্রদ্ধাশীল ছি
এবং একথাও লেনিন উল্লেখ করতে ভোলেননি যে টলস্টয় ছিলেন সোভি
বিপ্লবের অগ্রপথিক—'The forerunner of Russian Revolution' টল
যেখানে পথ নির্দেশ করতে পেরেছেন, শরৎচন্দ্র সেক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের প্রতি বিরূপ
ও সমর্থনের বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়েছেন — পথ খুঁজে পাননি।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য। তাঁর কাব্যে এক অদ্ভুত মমতা মাখ
বিস্ময়ের আলোড়ন। তাঁর কবিতা অখণ্ড উপলব্ধির কবিতা। 'সূর্যের আলোয় উ
রঙ কুমকুমের মতো নেই আর, হয়ে গেছে রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো',
এরকম একটি উপমা জীবনানন্দের আগে আর কোনো কবির কবিতায় আমরা দেখি নি
বিশ্বের মহত্তম কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ অবশ্যই একজন। জীবনানন্দ নিজের ম
একান্ত ভঙ্গিমায় তাঁর কবিতা লিখে গিয়েছেন। তাঁর কবিতা শান্তির কবিতা, শ্রা
কবিতা। কিন্তু এই নির্জন নিরিবিলি জীবনের আরও গভীরে, গভীর - গভীর
প্রদেশে যে বিপন্ন বিস্ময়ের আলোড়ন তাও তিনি অনুভব করেছেন, আর তখনই
কবিতায় পাশ্চাত্যের বহু কবির ভাবনা, আঙ্গিক ও শৈলীর প্রতিফলন ঘটেছে।
পূরবী কার বিভাসকে অজান্তে কানে কানে কি বলে যায় আমরা তা বুঝি না,
জীবনানন্দের কবিতা পড়লে বোঝা যায় সাহিত্যে একরকমই পারাপার চ
লেনদেনের হিসাবটা তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

জীবনানন্দ যখন কাব্য রচনা করছিলেন সে সময় কবিতার ক্ষেত্রে মস্ত যুগ পরিব
ঘটছিল। টি.এস. এলিয়ট একক প্রয়াসে ইংরাজী কবিতায় নতুন ধারায় কবিতা লি
পাঠকদের ঐতিহ্যলালিত চিন্তার জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। সন্দেহ
জীবনানন্দ, কীটস, টি. এস. এলিয়ট, মালার্মে, সুররিয়ালিস্ট, মেটাফিজিক্যাল কবি
কাব্যপ্রবাহে অবগাহন করে বাংলা কবিতায় নতুন স্বাদের প্রবাহ এনেছিলে
জীবনানন্দের হাতে বাংলা কবিতার পরিভাষা বদলেছে, ভঙ্গিমা তীক্ষ্ণতর, বিচিত্রতর
ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে, কবিতায় বিষয়বস্তু রাষ্ট্রিক ভাবনা থেকে ব্যক্তিগত পরি
নিজেকে নিমগ্ন রেখেছে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট, আত্মপ্রত্যয়শীল, স্পষ্ট
জীবনানন্দ কোনো এক কবিতায় লিখেছিলেন 'আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ
যাবে, স্বতঃসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে'। জীবনানন্দের এই উক্তিটি

কবিতার সম্বন্ধেও প্রাসঙ্গিক। অনেক সমালোচনা, অনেক উদাসীনতা সত্ত্বেও জীবনানন্দের কবিতা কবিতার শক্তিতেই দিগ্বিজয়ী ঘোড় সওয়ারের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

জীবনানন্দের এমন বেশ কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলির বেশ কিছু ছত্রে সুর-রিয়ালিজম এবং মার্লামের প্রভাব প্রত্যক্ষ। মালার্মের কবিতা সম্পর্কে Novalis র একটি পঙক্তি প্রণিধানযোগ্য —'..... Only melodious and full of beautiful words .... a few verses comprehensible, no more .... ' Hugo Friedrich তাঁর The structure of modern Lyric poetry তে মালার্মের কবিতা সম্পর্কে একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন, 'Mallarme's lyric poetry is the embodiment of total lonliness ....' In the eyes of others my work is what clouds are in the twilight, and the stars, useless ...'

উক্ত দুটি অভিমত মালার্মের কবিতা সম্পর্কে চিত্রকল্প নির্মাণে শৈলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীতরাতে — মড়ার হাতের সাদা হাড়ের মতন —
সেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান —'

সুররিয়ালিজম্ এর একটি অকৃত্রিম, বিশ্বস্ত উদাহরণ এই পঙক্তিগুলি। 'মড়ার হাতের সাদা হাড়ের মতন' 'আদিমরাত্রির ঘ্রাণ', - দুটি চিত্রকলাতেই অস্বাভাবিক রহস্যময়তার [illegible] লক্ষণীয়। সমগোত্রীয় আর একটি চিত্রকল্প আমরা পেয়ে যাই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে' — এ ধরনের চিত্রকল্প সৃষ্টির মধ্যে মালার্মে ও সুর রিয়ালিজম্ এর ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে মালার্মের উক্তিটি আমাদের মনোনিবেশ দাবী করে, 'Expunge reality from your song, for it is common .... The only thing the poet has to do is to work mysteriously with his eye turned upon Never'.

'[illegible] সন্ধির নৃত্য' কবিতাটিতে মেটাফিজিক্যাল কবিদের চিত্রকল্পের অনুসারী জীবনানন্দীয় চিত্রকল্প আমরা দেখতে পাই।

'..... সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা'

— এ ধরনের চিত্রকল্পের সৃষ্টিমাধুর্যে মেটাফিজিক্যাল কবিরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'ক... নারী যেন ঈশ্বরীর মতো' — সন্দেহ নেই একটি অসাধারণ চিত্রকল্প, কিন্তু স্বীকার ... নেওয়া ভাল জীবনানন্দের বহু আগে মেটাফিজিক্যাল কবিরা এধরনের চি... ব্যবহারে ক্লান্তিহীন ছিলেন।

ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি W.B.Yeats এর কবিতায় কখনও ... কখনও স্পেন্সার, কখনও আইরিশ লোকগাথা, আবার কখনও বা ব্লেক্ এর বি... ও আঙ্গিকের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সার্বিক অব... চিত্র তাঁর কবিতা ও আঙ্গিককে ভিন্নতর মাত্রা যোগ করে এবং প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণতার ... নিয়ে যায়। সমালোচক Gilbert Phelps লিখছেন 'In his best poems ... Irish sence comes to symbolize the whole human dilem... ইয়েটেসের শেষদিকের কবিতায় 'Human dilemma' বিষয়টি তাৎপ... জীবনানন্দের বহু কবিতায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবক্ষয় এবং সুস্থ চৈত... বিনষ্টিসাধন শাসক চেতনা রূপে সক্রিয়। আর এখানে Yeats এর প্রভাব ... জীবনানন্দের কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি। 'The second coming' ক... Yeats যে ভাব ও ভঙ্গিমায় মানবসভ্যতার নগ্ন রূপটিকে প্রকাশ ক... জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় তার স্পষ্ট অনুরণন ধ্বনিত হয়। ... second coming' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এবং তৎসহ জীবনানন্দের '... আঁধার এক' কবিতাটির কিছু অংশ সহায়ক জ্ঞানে উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে ... না। Yeats লিখছেন—

Things fall apart, the centre cannot hold;

Mere arnarchy is loosed upon the world, The blood dim... tide is loosed, and every where .

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity."

জীবনানন্দ লিখছেন—

অদ্ভুত আঁধার এক আসছে এ পৃথিবীতে আজ /যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; /যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই -প্রীতি নেই-করুণার/ আলোড়ন নেই/ পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। / যাদের গভীর আস্থা আজও মানুষের প্রতি/এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/ শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

পৃথিবীর দু প্রান্তের দুই কবি, কিন্তু বিষয় ও শৈলীর সাদৃশ্য আমাদের এই বিশ্বাসে স্থিত করে যে সাহিত্যে এরকমই ভাব ও বিষয়ের আদান প্রদান হতে থাকে।

জীবনান্দের 'শকুন' কবিতায় 'মাঠ থেকে মাঠে মাঠে — সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে আকাশে শকুনেরা চরিতেছে ....' সন্দেহ নেই, যুদ্ধের বীভৎসতাকে আমাদের সামনে মেলে ধরে, ঠিক যেমন Yeats এর কবিতায় তার নিদর্শন আমরা পেয়ে যাই। 'হায় চিল' কবিতাটিতে Yeats এর 'O Curlew, Curlew- বিন্যাসের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

টি. এস. এলিয়ট ইংরেজ কবি নাট্যকার, সম্পাদক এবং সমালোচক । এলিয়ট যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তার আগে কবিতার ধারা ছিল সরল, সহজবোধ্য এবং পূর্ণভাবে রোমান্টিক চেতনায় আক্রান্ত ও সমৃদ্ধ। এলিয়ট বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কাব্য-রীতির সূচনা করেন। জর্জীয় কবিদের কাব্য-রীতির বিকল্প হিসাবে 'ইগোয়িষ্ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক থাকার সময় কবিতায় চিত্রকল্পবাদীদের ক্রিয়াকলাপ তাঁকে আকর্ষণ করে, যদিও পরবর্তীকালে চিত্রকল্পবাদী কবিদের সঙ্গে এলিয়ট সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আধুনিক যুগের অবক্ষয়ী রূপটি তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। এলিয়ট তাঁর কবিতায় একেবারে ভিন্নতর এবং মৌলিক শৈলী প্রয়োগ করেন যা ইংরেজী কবিতায় তাঁর আগে দেখা যায়নি। এলিয়ট-এর কবিতায় সর্ব প্রথম আধুনিক ফরাসি কবিতার বুদ্ধিদীপ্ত ভাষার প্রয়োগ আমারা লক্ষ্য করি। হৃদয়হীন আধুনিক সভ্যতার বাস্তব চিত্র নির্মাণে এলিয়ট কখনও জন ডান এর আপাতবিরোধী চিন্তাধারা, কখনও গ্রীক বীর আগোমেনন এর কণ্ঠস্বর, ব্রাউনিং এর ড্রামাটিক মনোলোগের নাটকীয়তা, গ্রীক পুরাণের তাইরোসিয়াসের উল্লেখ, বহুক্ষেত্রে বোদলেয়ার, দান্তের অবাধ বিচরণ, সর্বোপরি এক ধরনের বীভৎস বিশ্লেষণ' প্রয়োগে ইংরেজী কবিতায় এক বিশেষ ধরনের সংহতি এবং আঙ্গিক গ্রথিত করেছেন। এম. এস. ব্রাডব্রুক যথার্থই বলেছেন এলিয়ট-এর কবিতায় রয়েছে 'A new

kind of image, a new kind of rhythm and a new mood'।

বিহঙ্গ চোখে একবার দেখে নেওয়া যাক জীবনানন্দের কবিতায় এলিয়ট-এর উপস্থি কতটা প্রভাব সঞ্চারী। একের একের এক ক্রমাগত প্রশ্ন চিহ্নের ব্যবহার এলিয়ট এ কবিতায় এক অদ্ভুত নাটকীয়তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। 'A Game of Ches কবিতায় লিখছেন 'What is that noise?'

> The wind under the door.
> 'What is that noise now? What is
> the wind doing ?'
> Nothing again nothing .
> 'Do you know nothing? Do you see
> nothing? Do you remember
> Nothing?'

.... 'What shall I do now? What shall I do ? 'জীবনানন্দ 'বোধ' কবিতা লিখছেন—

> 'সকল লোকের মাঝে ব'সে
> আমার নিজের মুদ্রা দোষে
> আমি একা হতেছি আলাদা ?
> আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
> আমার পথেই শুধু বাধা ?
>
> তাহাদের মন
> আমার মনের মতো নাকি ?
> — তবু কেন এমন একাকী ?
> তবু আমি এমন একাকী।'

আধুনিক সভ্যতার ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে এলিয়ট 'A Game of che কবিতায়, দুটি পঙক্তির মধ্যে রক্ত হিম করা একটি চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। —

> 'I think we are in rats' alley
> Where the dead men lost their bones'.

জীবনানন্দের 'অন্ধকার' কবিতায় ভাবের দিক থেকে সমার্থক চিত্রকল্প পাঠকের এড়ায় না।

'শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর,
এইসব ভয়াবহ আরতি।'

বর্তমান শতাব্দীর চিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে এলিয়ট প্রথাগত বিশ্লেষণ ব্যবহার না করে এমন অনেক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন যা এক ধরনের বীভৎসতায় পাঠকের মননকে শিহরত করে।

'I too awaited the expected guest
He, the young man carbuncular, arrives'.

জীবনানন্দের কবিতায় আমরা পেয়ে যাই —
'যেই কুঁজ — গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে / নষ্ট শসা — পচা চাল কুমড়ার ছাঁচে,'

এই একই কবিতায় এলিয়ট ফিরে গেছেন দান্তের 'Infarno'তে

'Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest

burning'

...টি কবিতা'য় জীবনানন্দের পঙক্তিগুলি এইরকম —

সে আগুন জ্বলে যায়— দহে নাকো কিছু। / সে- আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায় / সে আগুন জ্বলে যায় দহে নাকো কিছু'

...ling Towers/Jerusalem Athens Alexandria/ Vienna London/ ...eal'. জীবনানন্দের কবিতায় এলিয়ট এর ভাব ও শৈলীর অবিকল প্রতিধ্বনি শোনা ...—দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙ্গে;

... পতনের শব্দ হয়; .....'

...কবিতারই মূল সুর একধরনের প্রবাহমানতা। বক্তব্যের সাদৃশ্য, শব্দের বিস্তার। ... অনেকবার বলেছেন। মনে হয় পুনরুক্তি। আপাত ছন্দহীনতার মধ্যেও ছন্দের ...। এই প্রবহমানতার মধ্যেই এলিয়ট আর জীবনানন্দ অস্তিত্বের গূঢ় প্রশ্নাবলী, ...ের সংকট, মানুষ কি এবং কেন, মানুষ কতদূর যেতে পারে, কতদূর যায়-- সব ...ই শৈল্পিক সুষমায় প্রস্থিত করেছেন।

Time in Relation to Human Consciousness.

Dr. Aditi Bhattacharya
Department of Philosophy

Time is the most undefinable yet paradoxical of things; the pas is gone, the future has not come, and the present becomes the past even while we attempt to define it, and like the flash o lightning, at once exists and expires."--- Colton. Time itself is a mystery and when it is related to human consciousness it becomes more mysterious. From the very beginning of human civilization both the eastern and western thinkers in their attempt to solve this mystery raise these questions: What is time? How is it related to human consciousness? In this paper I would like to approach these questions from **existential** and **phenomenological** point of view in the light of the philosophy of **Edmund Husserl** and **Jean Paul Sartre**.

1

From phenomenological point of view consciousness is intentional, i.e. object-oriented. Consciousness is always consciousness of objects. The objects of consciousness are in time--arranged systematically in past, present and future. Similarly our consciousness of objects is also temporal---all our conscious acts occur in time. To signify this characteristic of our consciousness the term 'time-consciousness' is used by the **Phenomenologists.** Time-consciousness is the most fundamental and important of all phenomenological problems and Husserl tries to account for the nature of this time-consciousness by analyzing the way things appear to our experience in temporal flow. Husserl's lectures on Time-consciousness are collected in a volume entitled **On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time** (1893-1917). Husserl points out that in our experience we are

conscious of events flowing off in time in the world around us and we are also conscious of events flowing off temporarily within our own stream of experience. Husserl in his lectures on time consciousness tries to explore the doubly temporal structure of experience. When I hear a familiar song I hear a certain tone sung with a certain syllable and my present auditory experience of the song retains a series of immediately present notes or tone-syllables. As the song is familiar to me I can also anticipate a portion of the song which is to be followed immediately. Thus my auditory experience is a complex form of experience that binds my just preceding and just coming perceptions together with my immediate perception. In this experience of time-consciousness there is a double intentionality---here my consciousness 'constitutes' both the past and future of the melody I am hearing and the temporal past and future of my present stream of consciousness hearing the melody. My experience of hearing the familiar song is, according to Husserl, structured into the pattern of present impression together with a mosaic of the retention of the just past tones and protention (the term 'protention' has been coined by Husserl to match with the term 'retention') of just coming tones. Not only auditory experience, our other experiences are also experiences of this continuous flow of time. We may cite an example of our visual experience. When I look at a pelican flapping its wings, I in my present observation, retain the experience of having just seen the bird gliding along and also can see the bird gliding along the horizon after flapping its wings. One important thing should be noted here. The act of retention is not at all an act of memory or recollection. Our acts of memory through the process of recalling goes backward and 're-lives' a prior experience lying in the past. In memory we recollect the past experience and here there is a distinct demarcation between past and present experience. But through retention our consciousness gets hold of the past experience as part of the continuing phase of the current perceptual experience. In his famous Essay **Time:**

Linear or Cycle and Husserl's Phenomenology Dr. J. N. Mohanty has confessed that he himself was once a bit critical of Husserl's concept of the act of retention and viewed it an act of memory, but later he appreciated its true significance as rejuvenating the past experience within the fabric of present experience.

Husserl tries to point out that in our sensory flow of experience time is constituted/ intended by our consciousness. Constitution does not mean creation---consciousness does not create time, it constitutes time. It constitutes the flow of time within the sphere of the flow of present sensory impression with the retention of the past impressions and the protentions of future impression. By intertwining the past, present and future impressions consciousness constitutes time. On the other hand, the objects of the world appear to us in different perspectives with various sensible qualities and textures. All these sensible things—a bird flying into the sky, a wave crushing on the beach, the sun sinking in the horizon—are 'beings' persist in time. My consciousness constitutes simultaneously the complex relationships among objects, their sensory appearances and my flowing experience of the appeared objects in different points of time. This constituting consciousness is viewed by Husserl as something lying deeper behind the dynamic flow of time. Husserl describes this consciousness paradoxically as 'standing-yet-streaming'. As temporal process consciousness cannot be infinitesimally decomposed into constantly perishing and emerging small now-points—it is like a stream where every now includes in its fold 'just emerging present' as well as the 'just disappearing past' and the 'not yet arriving future' that is waiting to make its appearance in the flow of time. But as reflective consciousness, consciousness stands out of this flow and views itself as well as the experienced objects as subject to the temporal flow. Thus consciousness is in the flow of time but it is also the onlooker. In one of his

Lectures on time consciousness Husserl has given a dramatic description of this characteristic of self-consciousness or reflective consciousness : "There is one, unique flow of consciousness in which both the unity of the tone in immanent time and the unity of the flow of consciousness itself becomes constituted at once. As shocking.....as it may seem to say that the flow of consciousness constitutes its own unity, it is nonetheless the case that it does."

II

This phenomenological tradition of viewing consciousness as participating in the flow of time as well as constituting the flow of time as an onlooker has been carried out both in the philosophical thinking of Heidegger and Sartre. In this essay I shall concentrate on Sartre's thought. "Temporality is evidently an organized structure. The three so-called 'elements' of time, past, present and future should not be considered as a collection of 'givens' for us to sum up—for example, as an infinite series of 'nows' in which some are not yet and others are no longer—but rather as the structural moments of an original synthesis." This is Jean Paul Sartre's observation on time. In his classical work **Being and Nothingness** Sartre has given an elaborate account of how human consciousness, as a being-in-time, interacts with the three temporal dimensions past, present and future and has critically analyzed the experienced significance of these three temporal dimensions on the part of the man.

Sartre thinks our estimation of past as 'something which is no longer' is wrong because it emphasizes on the 'non-being' of past rather than its 'being'. But past is not something which has been melted away into nothingness---the 'being' of past constantly sips through and penetrates into my present. It does not merely exist in my memory or lies buried in my

consciousness making its appearance time to time. It exists for us as a reality. A man always feels that the past is 'his past'—it exists as part of his existence. Sartre has given an example of a man who is now forty years old and who was a student of Polytechnic School twenty years ago. It is evident that being the student of polytechnic constitutes the 'past' of this man of forty but this 'past' really exists as 'being' for this man though it is a 'different mode of being'—it is not at all a passing phase of his life having no connection with his 'present being' as a man of forty who is a successful business entrepreneur, a proud father of a five year old son and so on and so forth. His 'being as a student of Polytechnic' often peeps in his conversation with his colleagues or with his wife or in his reminiscences with his old friends. It may appear that this sort of continued existence of the 'past being' of a person as the 'different mode of being' is true only for the living persons. But this same thing is true for a person who is dead. When I say that my mother (who is no longer in this world) used to sit in the garden every evening and sing her favourite songs, I do not merely describe a past event, a passing phase, rather I am describing an event which is a part of my existence. I feel in my inmost depth that my mother has been for me as I have been for her and the fact of her sitting in the garden and singing there is a part of my present-being-in-the-world—it is not a mere memory which I possess. Thus the 'past being' of my mother who is no more is enlivened as her 'present being' in my memorization.

Sartre points out that a man cannot 'possess' or 'have' his past. When a man possesses a thing it remains completely external to him. As for example, a man can have a car or a house which do not exist as a part of his 'being'; whereas his past cannot exist as something external to his 'being'—it is a part of his existence. According to Sartre: "External relations would hide an impassable abyss between a past and a present which would then be two factual givens without real communication." Sartre points out that the past events of man's life alway

communicate with him. But if we describe the 'past' as 'being-in-the-present' it would destroy the real flavor of the past, because the past can never be the present---it is ontologically impossible. Another important thing should be noted here—it is through the human consciousness the past arrives in the world. An inanimate object has its past but the past only remains as an external part of its life history. Take an example of a book which was printed two hundred years back by a famous publisher of London and is now out of print. This past history has nothing to do with the book---it does not affect the book in the way it affects the book lover who collects rare books. The book lover becomes elated by coming across the book because the past history of the book manifests before his consciousness with all its antique value and significance. For him this past history of the book is not a 'dead past' but a 'living present'. Similarly, I may be annoyed or flattered respectively by the derogatory or praiseworthy remark of a person who made the remark a few days back. The remark which is a 'past event' affects me in so far as I am paying attention to it. I accept it as a reality and hence react and thus it is through my reacting consciousness the past remark is enlivened and acquires its significance for me. But I am not my past. Sartre says I am not my past because I was it. To clarify the nature of this past being, i.e. the mode 'was', Sartre writes: ".....if I am not what I was, it is not because I have already changed, which would suppose a time already given, but because I am related to my being in the mode of an internal bond of non-being."Human consciousness being thus characterized by nothingness is always beyond that which he was, but at the same time the 'being' which he leaves behind yet which constantly haunts him is his 'own being'; not 'another being'.

Now the point is to human consciousness 'what is present'? It is really very difficult to pin down 'present' in the flow of time---it is nothing but an infinitesimal instant which constantly moving backward to be lost in the past and stepping forward to delve

into the future. So for human consciousness 'present is not', it is a non-being; it cannot be described as 'it is' because that would impart a kind of 'passivity' to it and would steal away its ever-elusiveness. At present human consciousness or 'being-for-itself' (as described by Sartre) 'is not what it is (past) and is what it is not (future)'. In the words of Sartre "the for-itself is present to being in the form of flight; the present is a perpetual flight in the face of being".

As present is the 'perpetual flight' for the human consciousness, the question is: towards what is it fleeing? It flees towards the being which it is not, i.e. towards its future possibilities. Sartre points out that 'future' arrives in the world only by the human reality. Things are what they are—they have no possibility, no future. They are part of the actual world, complete in themselves having no potentiality for further development. Man, on the other hand, is not a complete being—there is a 'lack', i.e. a 'lacuna' in him and in order to overcome his 'lack' he always projects himself into the future. The 'being' of man is always at a distance and he tries to overcome this distance in his being by taking a leap into the future. According to Sartre, man, in his journey towards the 'being which it is not', always surpasses his present, his facticity. On the other hand, man's future is not only a call for his being that lies beyond, it is something that waits for him to be that which he likes to be. As for example, when I say 'I will be happy', it means that the present 'I' with all its past history will be happy. So what man wants to achieve by his future project is a part of him waiting to be realized, just as the past events of his life exist as parts of his being– he never loses his past. Sartre points out when man pays no heed to the constant call of his future being and thus fails to live as a 'possible being', he ceases to exist as 'being-for-itself' and this is a state of '**bad faith**', i.e. a static state of 'in-itself' bereft of all sort of possibilities.

In this context Sartre has made a distinction between **stat**

and **dynamic** temporality. By **static temporality** Sartre means a formal structure of temporality—in Kantian language 'it is an order of time' where the 'ordering principle is the relation before-after'. Sartre describes this order as an irreversible order where time is viewed as a series of succession. Time here acts as a separator by creating a 'distance' between the present me and the past me or the present me and the later me. To quote Sartre: "Time separates me from myself, from what I have been, from what I wish to be, from what I wish to do, from things and from others."

But Sartre points out that time is not solely a separator, it also unifies the events taking place in time and this unification is not an external relation. At this juncture he differs from the Associationist school which views unification only as an external relation. According to the Associationists, a temporal content 'A' exists in an instant and another temporal content 'B' also exists in the same mode as posterior to 'A' and they have no internal connection. But Sartre holds that there is a connection in the internal structure of these two temporal modes. It is with reference to 'B', 'A' becomes a prior temporal mode and similarly with reference to 'A', 'B' becomes the posterior temporal mode. Thus their priority and posteriority, i.e. their mode of existence in the flow of temporality is internally connected.

Sartre has also criticized Descartes and Kant who upheld that temporal unity, i.e. the relation of before-after, is conferred on the multiplicity of instants by a being who himself escapes temporality—'God' in Descartes or 'I think' and its forms of synthetic unity in Kant. Sartre points out that temporality do not allow its unity to be imposed upon it externally by some non-temporal existence or being. Temporality exists only as the infra-structure of a temporal being—this being is for-itself that temporalizes itself by existing. For-itself, being characterized by nothingness, always escapes its being, i.e. being-in-itself and by its nihilating acts it becomes diasporic in the sense of being

multi-dimensional. This multi-dimensionality of the for-itself is reflected in its various modes of existence in temporality.
The first dimension of for-itself is revealed in its relation with its past—its **facticity**. For-itself, by virtue of its nothingness separates itself from its past. "What it is, is behind it as the perpetual surpassed. It is precisely this surpassed facticity which we call the past."Sartre upholds it is from the point of view of the for-itself the 'past' exists. The 'past' for the for-itself appears in the world through its birth. The past is outside there like an inanimate thing, as for example, like a chair---but the past is not exactly like a chair because a chair does not haunt the for-itself while the past always haunts it. For-itself surpasses its past but it cannot undo it. The past is there not as a dead inanimate thing but which constantly bothers and influences the for-itself. In the words of Sartre: "The past is no longer behind; it does not cease being past, but I myself cease to be past."The past is the origin and spring- board of all my thoughts and actions.

In the second dimension for-itself apprehends its being as a certain **lack**---the lack which has to be fulfilled. Thus for-itself that, in the first dimension of its existence in temporality, was **'being- ahead of itself'** (by its perpetual surpassing of the given reality) is now **'behind itself** (by its constant attempt to achieve that which it is not)'.

Finally, in the third dimension, for-itself **escapes its being**. Whenever it tries to catch its being—it always escapes. That is the reason why Sartre says that man's attempt to seek 'repose in self' always ends in a failure.
By analyzing these three dimensions of man's mode of existence in temporality, i.e. in past, present and future, Sartre wants to point out that none of these dimensions have any ontological priority over the other. Yet emphasis can be given on the 'present mode of existence'—it is the juncture where for itself discovers its 'past as being surpassed' and its 'future as

lack lying there at a distance'. Thus temporality is not an external law which is imposed on human reality from without but is interiorized in the very fabric of his being as nothingness.

It is exactly in this context Sartre speaks of **dynamic temporality.** According to him dynamic temporality refers to a flow or course of time that indicates a fact of succession—where 'a particular after becomes a before, the present becomes past and a future a former- future'. Sartre here criticizes Kant and Leibnitz's claim for something permanent as the base of all sorts of changes. He points out that whenever we deal with human reality we need 'pure and absolute change'. For-itself has the power to metamorphose itself—it can delve into its past and at the same time push itself forward towards its future. This metamorphosis affects not only the pure present but also the former past and the coming future. The present constantly moves backward towards its past and goes forward towards its future and thus for-itself seems to be in a perpetual flight from the clutches of the in-itself which threatens it until the final victory comes in the guise of 'death' as the end of all possibilities. Here Sartre differs from Heidegger to whom awareness of man's imminent death makes him conscious of his 'true being' as 'possibility' and helps him coming out of his everydayness, i.e. his fallen state of existence.

IV

From the above exploration it is clear that from phenomenological and existential point of view time and consciousness are intertwined. Human consciousness is 'placed' in time, but it is also a 'source' of time—it is through human consciousness alone time acquires meaning. Past, present and future—the three phases of time have no significance but for human consciousness. Not only that, human consciousness alone can take hold of time by making it its 'own-time'. He can outgrow the 'limit' posed upon him by his

past and present state of existence and can make it the tool for his further development. Think of men like Lans Armstrong, Steve Jones and so many others like them who have ruled over time by ignoring the deadly disease creeping through their bodies. By accepting the 'limit' posed upon them by their 'diseased body' they have lived successfully as project-oriented individuals. Recently the famous and one of the world's richest black women Opra Winfrey paid a visit to our country. All of us know how she has outlived her deadly past and has started her journey as a new being who is inspiring the whole world with her marvelous 'Talk Show'—beckoning us to dream about a better and greater future. She reminds me of Celie, a black young girl, the central character of Alice Walker's novel **The Colour Purple.** Her journey towards the discovery of the power and joy of her own spirit against all sorts of miseries and pains is really unforgettable. I hope that my point is clear and instances need not be multiplied any more.

References:

1. Linear or Cyclic, and Husserl's Phenomenology of time consciousness—An Essay by J.N.Mohanty, printed in **Explorations in Philosophy; Western Philosophy, Essays by J.N.Mohanty**; edited by Bina Gupta, Oxford University Press, 2002.

2. **Being and Nothingness** by Jean Paul Sartre, translated by Hazel. E. Barnes; First published in English by Methuen & CO LTD in 1958.

3. **Lecture on consciousness and Interpretation**: J.N.Mohanty,Edited with an Introduction by Tara Chatterjee, Oxford University Press, 2009.

ভয়ঙ্কর সমুদ্র দানব

জয়জিৎ মন্ডল,
অতিথি অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

ঘূর্ণিঝড় মানে ঘূর্ণায়মান প্রচন্ড বাতাস। ইংরেজীতে একে বলা হয় সাইক্লোন (Cyclone)। এই সাইক্লোন শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন ক্যাপ্টেন হেনরী পিডিংটন (Henry Pidington) ১৮৪৮ সালে। এর মূল উৎস হচ্ছে গ্রীক শব্দ 'Kyklos / Kukloma' - যার অর্থ হল সাপের কুন্ডলী। নাম করণের বহুবছর পর আবিস্কৃত কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে নেওয়া সাইক্লোনের ছবি দেখলে তাই মনে হয়। নামটি যে সার্থক, সাইক্লোনের ছবি তা প্রমাণ করে।

ভূ-পৃষ্ঠের একরকম অনিশ্চিত ও অস্থায়ী বায়ু হল ঘূর্ণবাত। স্বল্প পরিসর কোন স্থান কোন কারণে হঠাৎ খুব উষ্ণ হয়ে পড়লে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সেখানে গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের (Deep Depression) সৃষ্টি করে। তখন আবহ পরিমন্ডলে বায়ুচাপের সমতা রক্ষার জন্য চারিদিক থেকে বায়ু ঘুরতে ঘুরতে ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হয়। এরূপ উষ্ণ কেন্দ্রমুখী উর্ধ্বগামী ঘূর্ণিবায়ুকে ঘূর্ণবাত (Cyclone) বলে। এই বায়ু উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিবর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত (Anti-clockwise) দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রবাহিত হয়। একে 'করিওলিস সূত্র' বলে।

- **ঘূর্ণিঝড়ের প্রকারভেদ (Types of Cyclone):**

উৎপত্তি অঞ্চলের পার্থক্য এবং প্রকৃতি ও চরিত্র ভেদে ঘূর্ণবাত দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (ক) উষ্ণ মন্ডলীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত, এবং (খ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত।

- **উষ্ণ মন্ডলীয় বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য:**

এই প্রকার ঘূর্ণিঝড় সাধারণত উভয় গোলার্ধের ২০° - ৩০° অক্ষরেখাদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১) এরূপ ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দ্রের (deep Depression) সৃষ্টি হয়। এখানে বায়ুর চাপ প্রায় ৮৫ মিলিবার পর্যন্ত নেমে যায় (অর্থাৎ বায়ুর চাপ থাকে ৯৫০ মিলিবার এর নীচে)।

২) একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের উচ্চতা হয় প্রায় ৯.৫ কি.মি, ব্যাস ৮০ থেকে ৮... কিলোমিটার এবং বায়ুর গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় ১২০ থেকে ১৬০ কিলোমি... পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩) এই প্রকার ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু কেন্দ্রে পৌঁছালে উষ্ণ ও হাল্‌কা হয়ে উপরে উ... যায় এবং তার মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা ওপরে উঠলে শীতল ... সংস্পর্শে এসে ঘূর্ণীভূত হয়ে জলভরা স্তূপ মেঘ (Cumulonimbus) ... সৃষ্টি করে। এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

- ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কে আবার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত। যথা -

  (I) প্রবল বা শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, এবং

  (ii) দুর্বল ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়।

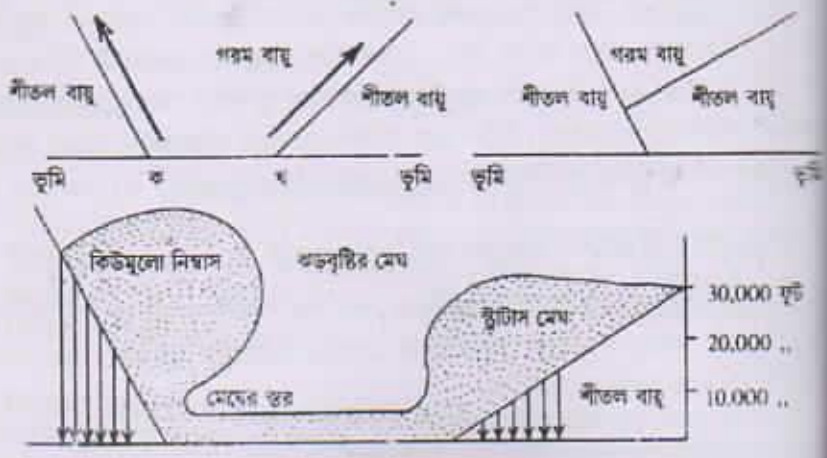

ঘূর্ণিঝড়ের চোখ (Eye of Cyclone)

সব ঘূর্ণিঝড়ে 'চোখ' দেখা যায় না। সাধারণত প্রবল বা শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে চোখ দেখা যায়। মূলত অত্যধিক উষ্ণতার জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দের (Very Deep Depression) উদ্ভব ঘটে। এররূপ অত্যন্ত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রকে 'ঘূর্ণিঝড়ের চোখ' (Eye of Cyclone) বলে। এই চোখ ঘূর্ণিঝড়ের আকারের তুলনায় ছোট এবং প্রায় বৃত্তাকার হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো এটি চ্যাপ্টাও হয়ে থাকে। চোখের ব্যাস প্রায় ৫-৫০ কিলোমিটার হয়। আবার কোন কোন ঘূর্ণিঝড়ে বিশেষকরে টাইফুনে এর ব্যাস প্রায় দ্বিগুণ ও হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের চোখে চাপ থাকে সর্বনিম্ন এবং তাপমাত্রা হয় সর্বাধিক। ঘূর্ণিঝড়ের চোখে বাতাস থাকে হাল্কা এবং মেঘ থাকে না বললেই চলে। বায়ু এখানে প্রধানত নিম্নমুখী থাকার কারণে বায়ুর মধ্যকার মেঘ বাষ্পে পরিণত হয় এবং অধিকতর চাপবিশিষ্ট স্তরের দিকে নামার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই প্রকার ঘূর্ণিঝড়ে বায়ুর গতিবেগ থাকে প্রতি ঘন্টায় ১২০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার।

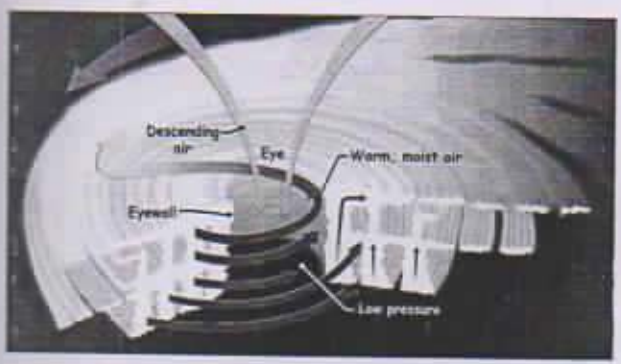

ঘূর্ণিঝড়ের চক্ষু ও বিভিন্ন পর্যায়

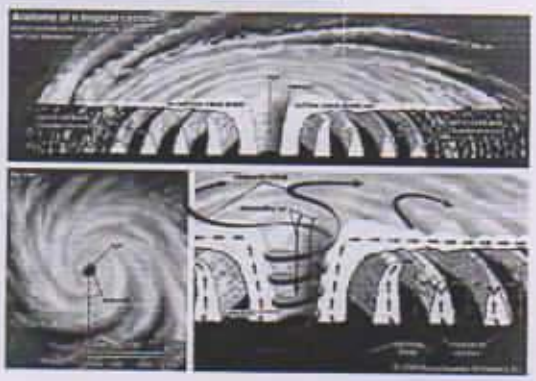

- বিভিন্ন এলাকার ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের স্থানীয় নাম

এলাকা	স্থানীয় নাম
উত্তর ভারত মহাসাগর (বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর)	সাইক্লোন বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন (Cyclone or Tropical cyclone)
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর	হ্যারিকেন (Hurricane)
উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর	টাইফুন (Typhoon)
অস্ট্রেলিয়া-র নিকটে	উইলি-উইলি (Willy - Willy)
উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর	পাপাগ্যালোস (Papagallos)
ফিলিপিন্স-এর নিকট	বাগুই (Baguios)
মাদাগাস্কার-র নিকট	ট্রোভাডোজ (trovadose)

উপগ্রহ থেকে নেওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ছবি

বাইরে বেরোতে নিষেধ করে বলা হয় প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে ব্যাটারি চালিত রেডিও ও তিনদিনের পানীয় জল ও খাবার মজুত রাখতে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস মতো ৩০ অক্টোবর ভোরে হ্যারিকেন স্যান্ডি ঘন্টায় ১৪৫ কিলোমিটার বেগে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে আছড়ে পড়ে। জলোচ্ছ্বস হয়েছিল ৪.২৭ মিটার উঁচু। দিনটি ছিল পূর্ণিমা। ভরা কটালের (spring Tide) কারণে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা এত বেশী হয়েছিল। সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সি। প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ে এই দুটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৪ থেকে ৫ ফুট জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ভার্জিনিয়া এবং ওহিওতে এক একমিটার উঁচু বরফ জমে যায়। মৃতের সংখ্যা ৯০ এর কিছু বেশী। এই বিশাল বিপর্যয় থেকে জনজীবন স্বাভাবিক হতে দীর্ঘ সময় লাগে। অর্থনীতিবিদদের মতে ক্ষতির পরিমাণ ৩ থেকে ৪ হাজার কোটি ডলার।

হ্যারিকেন স্যান্ডির বিস্তৃতি ছিল ১৫১৭ কিলোমিটার যা কোলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্বেরও কিছু বেশী। হ্যারিকেন আইরিনের বিস্তৃতি ছিল (৭৮০) ৭৮০ কিলোমিটার এবং ২০০৫ সালে ক্যাটরিনা হ্যারিকেন বিস্তৃতি ছিল ৭০০ কিলোমিটার। ১৯৯২ সালের হ্যারিকেন অ্যান্ড্রুর স্থান ছিল হ্যারিকেন শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে সর্বোচ্চ পঞ্চম শ্রেণী। স্যান্ডির ক্ষয়ক্ষতি কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্যান্ডি হ্যারিকেন ঝড়ের এই নামকরণটি করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড মিটিওরলজিক্যাল অর্গানাইজেশন। আবহাওয়া সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত আমেরিকায় ঝড়ের নামকরণের দায়িত্ব ছিল ন্যাশনাল হ্যারিকেন সেন্টার যেটি মিয়ামিতে অবস্থিত। বায়ু প্রবাহের গতিবেগের উপর নির্ভর করে হ্যারিকেন ঝড়ের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার আরও দু-একটি বিধ্বংসী হ্যারিকেন ঝড়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ২০০৪-এর আইভান ২০০৫-এর উইলমা (তৃতীয় শ্রেণী) ও ২০০৮ এর আইক (দ্বিতীয় শ্রেণী)।

ঘূর্ণিঝড় নীলম ঃ

স্যান্ডির তান্ডবে যখন মার্কিন প্রশাসন ব্যাতিব্যস্ত প্রায় সেই সময়েই ২৯ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার উপকূল লাগোয়া বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পরের দিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর সেটি পরিণত হয় সাইক্লোনে। এই সাইক্লোনটির নামকরণ হয়েছিল নীলম। নীলমের অবস্থান ছিল তখন চেন্নাই উপকূলের ৪৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং শ্রীলঙ্কার ট্রিনকোমালির থেকে ১৩০ কিলোমিটার

উত্তর-উত্তর-পূর্বে। খুবই ধীর গতিতে নীলম তামিলনাড়ুর উপকূলের দিকে এগোছিল। হারিকেন স্যান্ডির মতো অত শক্তিশালী না হলেও নীলমের তান্ডবে বিপদের আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে তখন থেকেই তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হতে থাকে। ৩১ অক্টোবর নীলমের গতিবেগ ঘন্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় সর্বশক্তির সঙ্গে এটি তামিলনাড়ুর মামল্লপুরমে (মহাবলীপুরমে) আছড়ে পড়ে। প্রবল বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়ায় চেন্নাই ও পুদুচেরির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে আগে থেকেই সমুদ্র উপকূলবর্তী মৎসজীবীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নীলমের দাপটে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। মামল্লপুরমে আছড়ে পড়ার পর নীলম স্বাভাবিক নিয়মে দুর্বল হয়ে পড়ে। নীলম দুর্বল হয়ে পড়লেও এটি নিম্নচাপ অক্ষরেখায় পরিণত হয় এবং তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার বিস্তৃত অঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

ঘূর্ণিঝড় আয়লা ঃ

২০০৯ সালে ২৫শে মে দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল এলাকায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় আয়লা। ২৫শে মে দুপুরে এটি প্রবল শক্তিসহ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়ে। ২৫মে আয়লার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১১২ কিলোমিটার। আয়লা ঝড়ে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল ও মেদিনীপুর এলাকায় ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছিল ১১৫ জন এবং বেসরকারি মতে এর সংখ্যা আরো অনেক বেশী ছিল। ১৯২টি ব্লকের প্রায় ৫৩ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই আয়লা ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা।

ঘূর্ণিঝড় পিলিন ঃ

১২ই অক্টোবর ২০১৩, অষ্টমীর সন্ধ্যে। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস। অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'পিলিন' একটু একটু করে ঢুকে পড়েছিল উড়িষ্যার গোপালপুর উপকূলে। প্রথমে 'ওয়াল ক্লাউড' পরে কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ, আই (eye)। রাত ৮ টার সময় আছড়ে পড়ল গোপালপুর আন্দামান উপকূলে সৃষ্ট 'পিলিন' শুরু থেকেই মোটামুটি উত্তর পশ্চিম অভিমুখে এ গিয়েছিল। স্থলে ভাগে আছড়ে পড়ার পরও তার অভিমুখ খুব একটা বদলায় নি। নবমীর সকালে (১৩ই অক্টোবর) সম্বলপুরের কাছ থেকে উত্তর দিকে ঘুরে যায় পিলিন। ছত্তিশগড়ে পৌঁছে আবার ও ডানদিকে বাঁক নেয়। পিলিনের দাপটে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ উঠেছিল ২৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। কোলকাতায় বাতাসের গতিবেগ ছিল ৩০ থেকে

৫০কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। ঘূর্ণিঝড় পিলিন প্রায় ৪০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

১৫ বছর আগে এমনই এক অক্টোবরে দিনে 'সুপার সাইক্লোনে' ধুয়ে মুছে গিয়েছিল ওড়িশার সমুদ্র সংলগ্ন এলাকা। মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার মানুষের। ১৯৯৯ এর সুপার সাইক্লোনের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ২৬০ কিলোমিটার। এ বছর পিলিনের আছড়ে পড়ার সময়টাও হল অক্টোবর এবং স্থানও হল ওড়িশা। তবে এবার অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'পিলিনের' হাত থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে নবীন পট্টানায়কের প্রশাসন। ৩৬ ঘন্টা বা একদিন দুইরাত্রি সময় পেয়েছিল নবীন পট্টনায়কের প্রশাসন। আর সেই সময়কেই কাজে লাগিয়ে রক্ষা পেল ওড়িশা। তাই মৃতের সংখ্যা ১৫ বছর আগের ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় ছিল অতি সামান্যই।

ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে ভারত মহাসাগর এলাকায় যে কোন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ও শ্রীলঙ্কা সহ মোট ৮টি দেশ।

যে পথে
এগিয়েছে ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় হাইয়েন ঃ

২০১৩ তে সবথেকে বিধ্বংসী ঘূর্ণীঝড় আছড়ে পড়ল ফিলিপিন্সে। গত ৮ নভেম্বর ফিলিপিন্সে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় 'হাইয়েন'। যার তান্ডবে ট্যাকলোবান শহরের প্রায় দু'লক্ষ মানুষের বাসস্থান শ্মশানে পরিণত হয়েছে। হাইয়েনের তান্ডবে মৃত ১০ হাজার মানুষের মধ্যে অধিকাংশই ট্যাক্যালোবান শহরের বাসিন্দা।

সাধারণত একটি নিম্নচাপ কেন্দ্র, সেই সঙ্গে উষ্ণ সমুদ্র (অন্তত ২৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা) থেকে জন্ম নেয় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়। তারপর যদি অল্প জায়গার মধ্যে তার গতিবেগ বা অভিমুখের বিশেষ পরিবর্তন না হয়, তা হলে সেই ঝড় একই জায়গায়

অবস্থান করে এবং শক্তি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। গতি ২ নভেম্বর 'জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার' জানায় যে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিম্নচাপটিই ক্রমশ পশ্চিম দিকে সরে যায়। সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগর এবং ফিলিপিন্স সাগরের জলতলের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । এর ফলস্বরূপ জন্ম নেয় ঘূর্ণিঝড় হাইয়েন। ঘন্টায় ২৩৫ কিলোটার গতিবেগ নিয়ে উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলে এ যাবৎ দ্বিতীয় শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের তকমা পেয়েছে 'হাইয়েন'। এমন কি মার্কিন সেনাবাহিনীর 'জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার' জানিয়েছে এক সময় পুরো এক মিনিট ধরে তার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৩১৫ কিলোমিটার। ইতিহাস বলছে, সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ছিল 'অলিভিয়া'। ১৯৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় আছড়ে পড়া ওই ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৪০৭ কিলোমিটার।

হ্যারিকেন ঝড়ের গতিবেগ মাপার জন্য ব্যবহার করা হয় সাফিন সিম্পসন হ্যারিসন স্কেল (Suffin Simpson Hurricane Scale) এই স্কেল অনুযায়ী ঝড়ের শ্রেনী বিভাজন নিম্নরূপ ঃ	
কিলোমিটারে ঝড়ের গতিবেগ	শ্রেণী
119-153	প্রথম
154-177	দ্বিতীয়
178-208	তৃতীয়
209-251	চতুর্থ
215-251 215তার উর্ধ্বে	পঞ্চম

সহায়ক গ্রন্থ

১. ভূগোল সমীক্ষা : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
২. ঘূর্ণিঝড় : আনওয়ার আলী
৩. জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা : তপনমোহন চক্রবর্তী
৪. আনন্দবাজার পত্রিকা

পাণ্ডুলিপির ইতি কথা

তরুণ কুমার সামন্ত
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

পুথি বা পাণ্ডুলিপি আমাদের জাতীয় সম্পদ বিশেষ করে প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগে যে সকল পুথি লিখিত হয়েছে তার সাহিত্যমূল্য কোনো কিছুর বিনিময়ে অপরিশোধ্য। তৎকালীন সময়ে কবি, নাট্যকার সর্বোপরি মহর্ষিরা তাঁদের স্বতঃপ্রণোদিত চিন্তা ভাবনা, সৃষ্টিকার্য সবই লিপিবদ্ধ করেছেন পুথিতে। শুধু তাই নয় চরকসংহিতা ও শুশ্রুত-সংহিতার মতো অপরিহার্য্য চিকিৎসাশাস্ত্র - ও তৎকালীন সময়ে রচিত ও লিখিত হয়েছে। এসবের পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যও লিখিত হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে। সহৃদয় পণ্ডিতবর্গ এই গ্রন্থগুলির পাঠোদ্ধার করে বহুমূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেছেন। যে তথ্য ও তত্ত্বগুলি বর্তমান সমাজকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে, উন্মোচন করেছে এক নতুন যুগের দ্বার, সূচনা হয়েছে এক নতুন অধ্যায়ের। তাই বর্তমান গবেষকগণ ও পণ্ডিতবর্গ আরও নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ধারের তাড়নায় ও পাঠোদ্ধার না হওয়া গ্রন্থের পাঠোদ্ধারের বাসনা ও কামনায় তাঁদের জীবনের অধিকাংশ সময় উৎসর্গ করেছেন পাঠোদ্ধারের কাজে। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামধন্যা অধ্যাপিকা ডঃ রত্না বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যিনি আজীবন পুত্রস্নেহে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ভারতবর্ষের বাইরেও বিভিন্ন দেশের পুথিকে নিরন্তন রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন।

গবেষণার বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে অন্যতম কঠিন কাজ হল পাঠোদ্ধার রূপ কাজ। তাই পাঠোদ্ধার কার্যের প্রতি পাঠোদ্ধারকারীর অন্তর্নিহিত ভালবাসা আবশ্যক। পাঠোদ্ধারকারীর অবশ্যই বেদ, বেদাঙ্গ, শব্দকোষ (অমরকোষাদি) ছন্দশাস্ত্র (লৌকিক ও বৈদিক) ব্যাকরণশাস্ত্র (বৈদিক ও লৌকিক), অলংকার শাস্ত্র এবং লৌকিকাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। পাঠোদ্ধারে ভাষাজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান যেমন আবশ্যক তেমনি লিপিজ্ঞানও তদ্রুপ জরুরী। পুথি যে সবসময় মধ্যযুগীয় বাংলা লিপি বা দেবনাগরী লিপিতে পাওয়া যাবে তা নয় তিব্বতি, উড়িয়া, ব্রাহ্মী, আরবী প্রভৃতি লিপিতে অজস্র পুথি লিখিত হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা হয়েছে বিভিন্ন সংরক্ষণ কেন্দ্রে।

পাঠোদ্ধারকারীকে বিভিন্ন পুথি সংরক্ষণ কেন্দ্রে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংরক্ষণ কেন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর বেদ বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের মিউজিয়াম, জোড়াসাঁকো

ঠাকুরবাড়ীর ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুথি সংরক্ষণ ও চর্চা কেন্দ্র অ্যাসিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি) - এর সাথে নিরন্তর যোগাযোগ রাখতে হবে। কারণ, কোন পুথি সংরক্ষণ কেন্দ্রে কোন বিষয়ে কী কী পুথি আছে তা খুব সহজেই জানা যাবে। তাছাড়া ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পুথিশালায় সংরক্ষিত পুথি ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে। পাঠোদ্ধারকারী যে পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার করবেন সেই পাণ্ডুলিপি যত বেশী সংখক পাওয়া যাবে পাঠোদ্ধার ততই সুখপ্রদ ও নিখুঁত হবে।

ইংরাজী Manuscript শব্দটি দুটি উপাদান দিয়ে গঠিত। ল্যাটিন শব্দ 'Manus'-এর অর্থ 'hand ' বা হাত এবং 'Scribere ' এর অর্থ 'লেখা'। এখান থেকে দুটি তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এটি হবে হাতে লেখা এবং দ্বিতীয়তঃ এটি কোনো লিপিতে লিখিত। এককথায় হাতে লিখিত গ্রন্থ বা দলিল হল পুথি বা Manuscript।

পুথি বা Manuscript শব্দটির নানান সমার্থক শব্দ পাওয়া যায় - প্রাচীন যুগে এটি পুস্তক নামে পরিচিত ছিল। ধারণা যে, 'পোস্ত' বা 'পুস্ত' শব্দ থেকে 'পুস্তক' শব্দটি এসেছে। 'পোস্ত' শব্দের অর্থ 'চামড়া'। পোস্ত বা চামড়ার উপর প্রথম লেখা হত বলে প্রাচীন যুগে সাহিত্যকৃতিকে বলা হত পুস্তক। পুস্তক একটি সংস্কৃত শব্দ।

প্রাচীন যুগের এই পুস্তককেই মধ্যযুগে বলা হত পুথি। অতএব, 'পুথি' ও 'পুস্তক' নাম দুটি আলাদা হলেও বস্তুতঃ দুটি শব্দের দ্বারা একই বস্তুকে বোঝানো হত। প্রাচীন যুগের শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত পুথি নামটি প্রচলিত ছিল।

পুথি শব্দের অন্য একটি প্রতিশব্দ হল পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি শব্দের ব্যুপত্তিগত অর্থ হল - [পাণ্ডু (√ পণ্ড্ + উ - কর্মবাচ্যে) শুক্লপীতবর্ণ বা ধূসর বর্ণ লিপি (√ লিপ্ + ই - কর্মবাচ্যে) লিখিত পত্রাদি ধূসর বর্ণের লিখিত পত্রাদি।]

প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি - পশুচর্ম, তালপত্র, ভূর্জপত্র, গাছের বাকলাদি লেখার যোগ্য উপাদান হিসাবে প্রস্তুত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। কোনো কোনো উপাদানকে (তালপত্রাদি) জলে ভিজিয়া হালকা রৌদ্রে শুকনো করা হত। আবার কোনো উপাদানকে দিনের বেলায় গাছের ছায়াতে বা হালকা রৌদ্রে শুকনো করা হত। তখন ঐ দ্রব্যগুলি নিজের স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে অনেকটা তামাটে বর্ণ ধারণ করত। কালের ব্যবধানে ঐ উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপেই পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করত। পরবর্তী কালে দেখা গেছে হাতে তৈরী

তুলট-পত্রাদির রঙও ছিল ধূসর বর্ণের। এ থেকে অনুমান করা হয় প্রাচীনকালে গ্রন্থ পাণ্ডুবর্ণের উপাদানে লিখিত হত বলেই একে বলা হত পাণ্ডুলিপি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মধ্যযুগে পুস্তক শব্দের পরিবর্তে গ্রন্থশব্দটি ব্যবহার করা হত। এর নামকরণের কারণ হল - 'folio' গুলি যাতে এলোমেলো না হয়ে যায় বা হারিয়ে না যা তার জন্য প্রতিটি 'Folio' এর নির্দিষ্ট স্থানে ছিদ্র করে রশি দিয়ে গ্রন্থন করা হত (বা বাঁ হত)। তাই তখন থেকে গ্রন্থ শব্দটির প্রচলন হয়।

পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতিঃ

বিশ্বজগতে খ্যাত অখ্যাত সমস্ত বস্তুরই নিজস্ব পরিচিতি আছে। পাণ্ডুলিপি ত ব্যতিক্রম নয়। পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায় -

(ক) সংক্ষিপ্ত পুথি পরিচিতি।

(খ) বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতি।

ক) সংক্ষিপ্ত পুথি পরিচিতিঃ

এখানে একটি পুথির বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হয়।

যথা -

1.	Manuscript No.	:
2.	Title	:
3.	Author	:
4.	Commentary	:
5.	Commentator	:
6.	Language	:
7.	Script	:
8.	Date of Ms.	:
9.	Scribe	:
10.	No. of Folio	:
11.	Size of Ms.	:

12. Substance :
13. Status (complete/Incomplete) :
14. Illustrations :
15. Missing (portion) :
16. Condition of Ms. :
17. Subject :
18. Remarks :

(খ) **বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতি ঃ**

বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন পুথির সামগ্রিক পরিচয় নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়। এখানে সংক্ষিপ্ত পুথি পরিচিতির সমগ্র বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়। এছাড়াও পুথির অন্যান্য বিষয় যেমন পুথিটি লেখার উদ্দেশ্য কি ছিল, কোন সময়ে পুথিটি লিখিত হয়েছে, কোন বার, মাস ও সালে পুথি লেখা শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে, পুঁথিটি কতদিন ধরে লিখিত বা রচিত হয়েছে, কোন রাজার পৃষ্টপোষকতায় পুথিটি লিখিত হয়েছে, কতজন লিপিকার ঐ পুথিটি লিখেছেন, প্রতিপত্রে কতগুলি পংক্তি লিখিত হয়েছে, লিপিকারের হস্তাক্ষর কীরূপ, পুঁথিটি কখন লিখিত হয়েছে, তখনকার সামগ্রিক পরিবেশ কেমন ছিল, সর্বোপরি কালাঙ্ক কোন পদ্ধতিতে পুথির কোন অংশে লিখিত হয়েছে প্রভৃতি পুথি মধ্যস্থিত সামগ্রিক বিষয় উপস্থাপিত হবে। এছাড়াও নমুনা স্বরূপ পুস্পিকাদি ও উদ্ধৃত করা হবে।

পুথির কাল নির্ণয় পদ্ধতি ঃ

পুথির কাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণতঃ পুস্পিকার উপর নির্ভর করতে হয়। তৎকালীন সময়ে লেখক অথবা লিপিকারেরা কাল প্রকাশ করার জন্য সংখ্যার পরিবর্তে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার মাস বা দিন বোঝানোর জন্য সরাসরি সোমবার, মঙ্গলবার বা অগ্রহায়ণ, মাস মাসাদি উল্লেখ না করে তৎপ্রকাশক অন্য শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার করেছেন।

উদাহরণ ঃ

"শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গগনে।

এই হেতু হইল গীত প্রকাশ ভুবনে।।"
(কালিকামঙ্গল)

এখানে সংখ্যা বাচক শব্দ গ্রহ = ৯, বসু = ৮, ঋতু = ৬ এবং বিধু = ১ এবং 'শাকে' শব্দের অর্থ হল শকাব্দে। এভাবে গণনা করলে ৯৮৬১ শকাব্দ হয় যা এখন অবাস্তব। কিন্তু "অঙ্কস্য বামাগতি"ঃ এই নিয়মানুযায়ী এখানে হবে ১৬৮৯ শকাব্দ (1767 খ্রীঃ)

সংখ্যার পরিবর্তে যে সকল সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার হত তার একটি ছোট তালিকা নিম্নরূপঃ -

০ = শূন্য, খ, গগন, বিন্দু, আকাশ, রন্ধ্র ইত্যাদি।

১ = চন্দ্র, চন্দ্রমা, সূর্য্য, নিশাকর, দিবাকর, অবনি ইত্যাদি।

২ = মিথুন, বাহু, পাদ, কুচ, ভ্রু, নেত্র, নদীকুল, যুগল ইত্যাদি।

৩ = ত্রি, কাল, লোক, শিবচক্ষু, প্রণব, ত্রিবেদী, ত্রয় ইত্যাদি।

৪ = বেদ, আশ্রম, বর্ণ, পুরুষার্থ, ব্রহ্মানন, বিষ্ণুর বাহু ইত্যাদি।

৫ = পাণ্ডব, বান, বায়ু, তৃণমূল, পল্লব, শর ইত্যাদি।

৬ = ঋতু, ষড়জ, ভগ, অরি, গুণ, রস ইত্যাদি।

৭ = ঋষি, লোক, মুনি, মহর্ষি, অশ্ব, বাজী, সিন্ধু ইত্যাদি।

৮ = বসু, হস্তী, গজ, ঈশমূর্তি, ব্যাকরণ, দিগ্‌গজ ইত্যাদি।

৯ = অঙ্ক, ছিদ্র, দ্বার, নব, রন্ধ্র, অঙ্ক, দুর্গা ইত্যাদি।

মাস বোঝানোর জন্য যে সকল শব্দের ব্যবহার ছিল -

মাস	প্রাচীন নাম	নক্ষত্রের নামানুযায়ী
বৈশাখ	মাধব	বিশাখা
জৈষ্ঠ্য	শুক্র	জ্যৈষ্ঠা
আষাঢ়	শুচি	পূর্বাষাঢ়া
শ্রাবণ	নভঃ	শ্রবণা

ভাদ্র	নভস্য	পূর্বভাদ্র পদ
আশ্বিন	ঈশ	অশ্বিনী
মাস	প্রাচীন নাম	নক্ষত্রের নামানুযায়ী
কার্ত্তিক	ঊর্য্য	কৃত্তিকা
অগ্রহায়ণ	সহঃ	মৃগশিরা / মাগশীর্ষ
পৌষ	অহস্য	পুষ্যা
মাঘ	তপ	মঘা
ফাল্গুন	তপস্য	উত্তর ফাল্গুনী
চৈত্র	মধু	চিত্রা

দিন বোঝানোর জন্য যে সকল প্রতীকী শব্দের ব্যবহার হয় তা হল -

বার	প্রতীকী শব্দ
রবিবার	আদিত্য বাসর
সোমবার	বিধু বাসর
মঙ্গলবার	অঙ্গারক বাসর
বুধবার	শাশঙ্কি বাসর
বৃহস্পতিবার	গুরুবাসর
শুক্রবার	ভার্গব বাসর/দৈত্যগুরু বাসর
শনিবার	শনৈশ্চর

পুথির কালাঙ্ক নির্ণয়ের সময় আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় পাঠোদ্ধারকারীকে। সেটি হল -

পুথির কাল সবসময় খ্রীষ্টাব্দে বা বঙ্গাব্দে প্রকাশ করা থাকে না। কলিযুগ সম্বৎ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি অব্দে (সংখ্যা বাচক শব্দে এবং জ্যোতিষীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে) প্রকাশ করা হত। বর্তমান কালে সমস্ত পাঠকের সুবিধার্থে (পাঠক যাতে

সহজেই সময়টা বুঝতে পারে তার জন্য) পাঠোদ্ধারকারী ঐ সকল অব্দকে খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বর্তমান। যিশু খ্রীষ্টের জন্মকে কেন্দ্র বিন্দু করে কোন অব্দের সাথে কিছু সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করে খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন পরিবর্তন / ধর্মান্তরণ এর নমুনা নিম্নে দেওয়া হল -

১) সম্বৎ - ৫৭ = খ্রীষ্টাব্দ {(১২৬০ সম্বৎ - ৫৭) ১২০৩ = খ্রীঃ}

২) বঙ্গাব্দ + ৫৯৩ = খ্রীষ্টাব্দ {(১০৫৫ বঙ্গাব্দ + ৫৯৩) ১৬৪৮ = খ্রীঃ}

৩) শকাব্দ + ৭৮ = খ্রীষ্টাব্দ {(১৫৫৭ শকাব্দ + ৭৮) ১৬৩৫ = খ্রীঃ}

ইত্যাদি।

A review on Polymer & Bioplastics

Dr.Bireswar Mukherjee
Department of Chemistry

Relative small molecules have provided the basis for most of our study of organic chemistry, yet we know that very large molecules–*macromolecules*–play a very important role in the chemistry of life processes. Polyamides and polysaccharides are structural components of living organisms, and they also constitute two of the three principal classes of human food stuffs. Nucleic acids are the macromolecules responsible for transmission of genetic characteristics in living organisms. Macromolecules of synthetic origin also affect our lives. The materials known as plastics serve us in a variety of ways. They are used as structural materials, as fibers, and as protective films, and they seem indispensable to the modern world. The quantity of polymeric materials marketed by the chemical industry far exceeds the amount of all other synthetic organic chemicals. The economic impact of those materials in such that over one-half of the chemists employed by industry are in some way associated with the production of macromolecules. The large molecules are composed of many smaller units known as monomers. The chemical combination of many monomers leads to macromolecules known as polymers. Characteristics of polymers can be related to the nature of the monomer units as well as intra-and intermolecular interactions within the macromolecules.

Before 1930, polymers were believed to be colloidal aggregates of many small molecules. Their properties were attributed to various attractive forces which held the components together. The pioneering work of Staudinger provided a basis for our modern understanding of polymers by showing that polymers are actually macromolecules. Staudinger received the Nobelprize for chemistry in 1953 for his work, and Flory was awarded the 1974 Nobel prize for

chemistry for developing methods for studying properties of macromolecules. Polymers are composed of sequences of repeating monomers units connected by covalent bonds. When all monomer units are identical, a homopolymer is formed. Copolymers consist or more than one kind of monomer unit which can be arranged in a variety of ways. The degree of polymerization; i.e., the number of monomer molecules that combine to form a particular macromolecule. Both polymers depicted above are linear arrays of monomer units. In a linear polymer, every monomer must form a bond at each of its ends. Another arrangement of monomer units leads to a branched polymer. Branched polymers are copolymers that contain some monomer units with three or more points of covalent bonding to other monomer units. Bonds between polymer chains are known as cross-links. Cross-links may form during the initial polymerization process or by subsequent reaction of polymer chains. Functional groups along the polymer chains must be activated when cross-linking occurs after initial polymerization. In some cases, the functional groups of the monomers form the cross-links; in other, additional small molecules are added to promote and participate in the cross-linking process. Although a large number of polymer structures are known, only a few general types are of broad importance. The polymeric hydrocarbons formed from alkene monomers probably represent the largest industrial output of polymers. Polyethylene, polypropylene, and polystyrene fall into this category. Polyamides are exemplified by the synthetic polymers of nylon and the natural protein polymers such as wool. Polyesters, the components of many synthetic fibers, are a third general structural type.

The principal characteristics associated with polymers are a consequence of the nature and covalent arrangement of the monomer units. In the case of proteins that is referred to as the primary structure. However, the covalent bonds do not account for all of the observed properties of most polymers. Weaker intermolecular forces between polymer chains must

also be considered. Hydrogen bonding, electrostatic interactions, and van der Walls forces are believed to be the most important of these "weak" interactions. The results of bonding and nonbonding interactions lead to polymers with a variety of physical characteristics. Some, like polyvinyl chloride and the cellulose-lignin of wood, are sufficiently hard and strong to be used as building materials. Bakelite is hard but is also brittle, and so it is limited to use in forming small items in which the strength is not critical. The synthetic polyamide nylon and the natural polyamide silk have excellent tensile strength when formed into fibers. Polymers such as rubber are known as elastomers. Elastomers are soft yet sufficiently elastic that they rebound to their original shape after being distorted. One classification of polymers is based on behaviour when heated. Polymers that soften or melt and then solidify and regain their original properties on cooling are thermoplastic. Polymers that soften or melt on warming and then become infusible solids are thermosetting. The latter term implies that thermal decomposition has not taken place. Thermosetting polymers become rigid on heating because of cross-linking or further polymerization. Functional groups that remain after incomplete polymerization are one source of the reactive centers required for thermosetting character.

The flow of melting property of a polymer is important in respect to polymer use in fabricating commercial products. Many molding plastics are shaped while molten and are then heated further to become rigid solids of desired shapes. Various polymer resins undergo reaction to become solid when treated with an initiator (often a peroxide) without extensive heating in a process which resembles thermosetting. Chemical treatment of natural rubber is illustrative of the types of processing used to improve the properties of polymers. Rubber latex is a colloidal suspension of polyisoprene obtained from certain plants native to tropical regions. Hevea rubber–a natural rubber–is composed of *Z*-polyisopropene, a long hydrocarbon chain of 1,000 to 5,000 isopropene units.

The polyisopropene chains are randomly coiled and bound together by intermolecular van der Walls forces. Because the intermolecular forces are very weak, an external deforming force not only stretches the coiled polymers but allows them to slip past each other in plastic flow. When the force is released, the polymer chains do not completely return to their original positions.

In other to make it more elastic, natural rubber is heated with sulphur in a process known as vulcanization. Sulfide and disulfide cross-links from between polymer chains and provide sufficient rigidity to prevent plastic flow. Soft rubber contains 1-2% sulphur. If too much cross-linking takes place, the rubber becomes a rigid solid and loses its elastomer properties.

Conventional plastics, formed from fossil fuels, are one of the important materials for the society but they are created with a process which is harmful to the environment. In order to find alternatives, a new materials has been developed from as bioplastic. Bioplastis are long chain of monomes joined with each other by ester bonds. These plastics are thus considered as polyesters. Bioplastics are classified into various types. The most common is PHA (Polyhydroxyalkanoate), which remains as a carbon and / or energy storage materials in various microorganism under the condition of deficient nutritional elements. There are a variety of bioplastic applications in the society and industries. Plastics are consumed in almost every place such as, in routine house hold packaging material, in bottles, cell phones, printers etc. It is also utilized by manufacturing industries ranging from pharmaceutical to automobiles. They are useful as synthetic polymers because their structures can be chemically manipulated to a variety of strengths and shapes to obtain higher molecular weight, low reactivity and long durability substances. Plastics are important materials for the society not only because of their higher molecular weight and low reactivity but also for their durability and cost efficiency. Unfortunately these petroleum

based plastics are not biodegradable. This result in one of the major cause of solid waste pollution through buried in landfills. They are indigestible and in many cases the animals die due to plastic blockage in the gut. Furthermore plastics are often soiled by food and other biological substances making physical recycling of this material undesirable. Incinerating plastics had been one option but other than being expensive it is also dangerous; various harmful chemicals like hydrogen chloride and hydrogen cyanide are released during its incineration. In recent years, there has been increasing public concern over the harmful effects of petrochemical derived plastic materials in the environment. Problem of managing plastic waste on the earth is increasing very rapidly now a days, and studies have been initiated to find out suitable eco-friendly materials to minimize environmental problem.

To find alternatives researchers have developed fully biodegradable plastics, which are disposed in environment and can easily degrade through the enzymatic actions of microorganisms. The degradation of biodegradable plastic produces carbon dioxide, methane, water, biomass, humic matter and various other natural substances which can be readily eliminated. Due to its ability to degrade in the biotic environment, these types of material are termed as "Bioplastics."

Bioplastics are a special type of biological material which is degradable and eco-friendly in their chemical nature. They are polyesters produced by a range of microorganisms; cultured under different nutrients and environmental conditions. Bioplastics are mainly classified into two types: photodegradable and Semi-biodegradable plastic. The former have light sensitive groups incorporated directly into the backbone of the polymer as additives. Due to lacking of sunlight in landfill they remain non-degraded and not used widely, while the latter can be degraded by bacteria because they attack starch easily and remaining polymer released can be degraded

by other bacteria. Due to presence of starch, bacteria attack and turnoff availability of polyethylene fragments thereby remain non-degradable. Other type of biodegradable plastic is rather new and promising because of its actual production and utilization by bacteria to form biopolymer. These polymers, usually lipid in nature, are accumulated as storage material (in the form of mobile, amorphous, liquid granules) in microbes and allow microbial survival under straineous conditions. This storage material is known as polyhydroxyalkanoates (PHAs), which store carbon and energy, when nutrient supplies are imbalanced. These polyesters, known as Bioplastics contain long chains of monomer which join with each other by ester bond. Bioplastics are accumulated when bacterial growth is limited by depletion of nitrogen, phosphorous or oxygen and excess carbon source is provided.

Bioplastics have evolved into an innovative area of research for scientists around the world. This progressive development has been driven by a need for environmentally friendly substitutes for materials derived from fissil fuel sources. In addition, recent high prices for crude oil, and the potential market for agricultural materials in bioplastics are driving an economic push towards expanding the bioplastic industry and provided better alternative for sustainable development of the future environment.

References:

I)Organic Chemistry, I.L.Finar
II) Organic chemistry, Boyed
III) Different web site related to Polymer & Bioplastics

Silent Witnesses : Palynology in Crime

Dr. Supatra Sen
(Botany)
Department of B.Ed.

Palynology is the science that studies contemporary and fossil particles such as pollen and spores, together with organic matter found in sedimentary rocks and sediments. A branch of the earth sciences, such as geology and biology, palynologists study both pollen and powdered minerals.

Pollen is incredibly differential and thus positively indicates where a person or object has been. Its distinctive differences are hugely dependent on both the varying regions of the world and particular plant species. Pollen can also reveal the season in which a crime was committed as well as in the tracing of mass activity - such as genocide graves. Palynology also indicates if a body has been moved, and allows the experts to trace back to where a crime may have taken place. Pollen is often microscopic and even after washing clothes, pollen can remain in pockets or cuffs which allows the evidence to be collected even up to long periods after the event.

The term **"Forensic Palynology"** refers to the use of pollen and spore evidence in legal cases [1]. In its broader application, the field of forensic palynology also includes legal information derived from the analysis of a broad range of microscopic organisms - such as dinoflagellates, acritarchs, and chitinozoans - that can be found in both fresh and marine environments [2]. However, in most sampling situations, forensic palynologists rarely encounter these other types of organisms because most are restricted to fossil deposits. Studies of palynomorphs trapped in materials associated with criminal or civil investigations are slowly gaining recognition as valuable forensic techniques.

It is difficult to establish precisely when the field of forensic palynology began. Attempts made prior to the 1950s, whether successful or not, probably did not gain much public attention and therefore were not reported. Or, it is possible that if earlier attempts were made, the results may have been purposely hidden from the media in order not to alert criminals about the use of this new technique.

One of the earliest reported cases using forensic palynology occurred in Sweden in 1959. This case revolved around a lady who was killed in May, during a trip in central Sweden. During the court hearing, a number of experts, including a palynologist, were asked to examine dirt attached to the lady's clothing. The objective of those studies was to determine whether or not the lady was killed where she was found, or if she had been killed elsewhere and then dumped at the site where her body was discovered. Preliminary studies of the pollen in the dirt samples suggested that she had been killed elsewhere because the dirt lacked pollen from plants common in the area where the body was found (*i.e. Plantago, Rumex* and grasses). However, a later reinterpretation of the forensic pollen samples noted that the murder could have occurred in May because that was before the grasses and herbs in the region had pollinated. The two opinions were both entered as evidences in the court proceedings, but we do not know if the murder was ever solved. The importance of this case is that it is one of the **earliest records** in which pollen data were considered as important forensic evidence in a court case.

It may be argued that the pollen assemblage of a particular scene, for example an open grassy area, could be similar to the pollen assemblage of any other similar open grassy area. Horrocks has also shown that this is not the case; while different soil samples collected from within a localized region (up to 15 m) show similar pollen assemblages, there were significant differences among soil samples collected from

different localized regions of similar vegetation type (up to 1 km). Again, a significant demonstration that pollen evidence is a useful tool in associating suspects and objects with crime scenes [3].

In other early cases, during the 1960s and 1970s, Max Frei, a noted Swiss criminal analyst, often used pollen as a forensic tool to link suspects to events or to crime scenes [4]. Some of his most noted cases include one in which a suspect claimed that his pistol could not have been used to commit a recent murder because it had not been removed from its storage box in months. However, Dr. Frei proved the suspect was lying because the grease on the pistol contained alder and birch pollen, both of which were pollinating when the murder occurred, not when the suspect claimed he had last cleaned the pistol and put it away. In another case Dr. Frei showed that a document was a forgery because he found fall-pollinating cedar pollen stuck to the ink used to sign a document, which had a June date [5].

During most of 1994 and 1995, one of the most publicized court cases in history made front-page headlines in newspapers and magazines all over the world. This was the murder trial of the famous football and movie star O.J. Simpson that ended in October, 1995 when the jury found the defendant innocent.

Mr. Simpson was accused of killing his wife and one of her friends during a rage of jealousy. News stories reported that the trial became so popular as a media event that over one and one-half million people watched it daily on TV. During those court proceedings, some of the most important items of evidence were forensic samples of fibers and hairs, and DNA analyses of blood-stained clothing and blood found at the crime scene, in the defendant's car, and in his home.

In spite of all the television coverage and media attention, both the prosecution and defense missed one potentially valuable

piece of evidence - forensic pollen evidence that might have been attached to the defendant's clothing. Had the clothing that Simpson supposedly wore on the night of the crime been examined, it might have contained certain types of pollen that the prosecution could have used to link the suspect to the scene of the crime. If the examination revealed no pollen, that evidence could have been used by the defense to argue that the defendant was not at the scene of the crime.

Testimony during the Simpson trial suggested that the person or persons, who committed the double murder may have hidden in bushes in front of the Simpson home waiting for the victims. If this assumption is correct, it is possible that pollen from the flowers on the bushes, or pollen that may have fallen from the flowers onto the bushes' leaves might have brushed off on the assailant's clothing. If that occurred, then it would have left a "pollen fingerprint" on the person's clothing that could have linked the killer to the crime scene.

Pollen and spore production and dispersion are important considerations in the study of forensic palynology. First, if one knows what the expected production and dispersal patterns of spores and pollen (called the pollen rain) are for the plants in a given region, then one will know what type of "pollen fingerprint" to expect in samples that come from that area [6]. Therefore, the first task of the forensic palynologist is to try to find a match between the pollen in a known geographical region with the pollen in a forensic sample. Knowledge of pollen dispersal and productivity often plays a major role in solving such problems.

There are a number of different methods by which plants disperse their pollen or spores. A small group of plants are called "autogamous" because they are self-pollinating and are so efficient that little pollen is needed. Most plants in this category produce less than 100 pollen grains per anther. Pollen from these plants is rarely dispersed into the

atmosphere even though their pollen preserves well and has a durable outer wall, called an "exine," made of a stable chemical compound called "**sporopollenin**." Like pollen produced by submerged plants, the pollen of autogamous plants is of little value in forensic work because it is dispersed in minimal numbers.

In a larger group of plants, called zoogamous plants, pollination is dependent upon the transport of pollen by some type of insect (i.e., bee, wasp, beetle, moth, ant) or animal (*i.e.*, hummingbirds, lizards, nectar-feeding marsupials and bats or other small mammals). Because of the efficiency, pollen productivity is low, yet not as low as is found in autogamous plants. The potential **value of zoogamous pollen in forensic work is excellent for two reasons**. First, zoogamous pollen grains have some of the most durable exines. This means their pollen often will remain preserved in deposits for long periods of time and are generally less susceptible to destruction than pollen grains dispersed by other methods. Second, zoogamous pollen is produced in low amounts, thus is not normally a potential contaminate found in the pollen rain of an area. This last point is both good and bad. It is good because if the pollen of a zoogamous plant is found in a forensic sample, there is a high degree of confidence that the pollen belongs with the forensic sample and is not an atmospheric contaminate. It is bad because so little pollen is produced by each plant that the chances of its pollen getting into a forensic sample are reduced.

The last category is the wind-pollinated (anemophilous) type. This group includes a wide range of producers such as the gymnosperms and a significant number, but not a majority, of the angiosperms. Also included in this group are spore-producing plants such as fungi, ferns and mosses. Because wind pollination is the most inefficient method of dispersion, anemophilous plants must produce vast quantities of light-weight grains that will travel easily in air currents. Some species of wind-pollinated plants, such as marijuana (*Cannabis*),

produce as many as 70,000 pollen grains per anther [2]. When large fields of these anemophilous plants grow together, their flowers can produce millions of pollen grains that are dispersed daily during the flowering season. In many cases, this abundance becomes a disadvantage because often marijuana pollen occurs in trace amounts on the shoes of people connected with the drug trade. Nevertheless, when such evidence is found, a palynologist cannot state in court that "traces of *Cannabis* pollen could only have come from direct association with, or use of, the actual plant." Instead, if asked, a palynologist would have to admit that traces of marijuana pollen on a suspect's shoes could have come from almost anywhere as a result of "random air dispersal" of that plant's pollen. An example of this occurred during the summer of 1995 when European newspapers reported that "clouds" of *Cannabis* pollen were drifting across the Mediterranean from source areas in Morocco, where local farmers reported growing a bumper crop of marijuana. European residents along the Mediterranean coast were also warned by local newspaper not to breath "too much" of the *Cannabis* pollen because it could cause hallucinations. This last statement, however, is completely false because Cannabis pollen does not cause hallucinations. Nevertheless, the high atmospheric counts of *Cannabis* pollen illustrate how some of these grains might accidentally occur in some forensic samples.

Another important factor is the **"sinking speed"** or rate at which a pollen grain falls to earth. Marijuana, alder, juniper and birch pollen are very small and very light. Their average fall rate is about 2cm per second. On the other hand, maize plants and fir trees produce pollen that are large and heavy, and fall to earth at a rate 15 times faster than the lighter ones. Using just these two examples, one can see that the potential distribution area of maize and fir pollen grains will be smaller and more restricted that the dispersion area covered by the pollen from plants in the first category [7]. In

orensic studies this means that when maize and similar types

of large pollen grains are found in samples, small dispersion areas are indicated and greater precision in identifying the source region may be possible.

The way in which samples are collected and processed is also critical, and both must be done correctly to obtain accurate results. Ideally, pollen samples should be collected by a competent palynologist knowledgeable in the field of forensics. Such individuals will know how to collect contamination-free samples, and will know what precautions should be taken to ensure that samples remain contamination-free throughout the storage, laboratory extraction phase, and the analysis process. It is also important to keep accurate records of how each sample is collected and what has happened to each sample from the time of collection until the analysis is complete and reports are presented.

Security is another essential concern. To ensure the court admissibility of forensic evidence, it is critical that a palynologist be able to state under oath that the materials, and the subsequent pollen samples collected from those materials, were stored in a locked and secure location. This aspect is also essential to avoid the accusation that someone else, who was not authorized, gained access to a sample and "switched" it. If any kind of contamination or switching, either natural or intentional, can be proven or implied, then doubt will be cast upon the resulting interpretations [8].

One final concern is the amount of material that will be collected for forensic analysis. In most cases very little dirt, mud or other debris is available for collection and analysis. Therefore, most forensic palynologists face several immediate problems. First, they will generally not have enough sample to experiment with different extraction techniques to determine which works best. Second, the will often not have enough sample to conduct a second test if something goes wrong (i.e., a centrifuge tube breaks, a beaker spills, or a microscope slide breaks). Third, sample size may be further reduced when other

potentially useful tests may need to be carried out first (i.e., soil testing, searches for fibers, sand grain analysis) before a destructive pollen analysis can be attempted.

Forensic palynology is still in its infancy. It remains untried in many regions of the world, is seldom used in other regions, and is not yet accepted or recognized as being valuable evidence in most court systems. There are also still misconceptions about what types of information forensic pollen samples can provide. Often police and other investigators regard forensic samples, and the testing results, only as tools that can be used to "convict" a suspect.

Often, many types of forensic data, such as pollen results, do not actually "convict" a suspect [9]. Instead, the samples are useful tools that can point investigators in the "right" direction, or narrow the number of suspects, or perhaps even eliminate a person as a prime suspect. Nevertheless, forensic palynology going through a 'trial' period in many nations, can become a powerful tool of the forensic scientist in the days ahead.

References

1. Mildenhall, D.C., Forensic palynology. Geological Society of New Zealand Newsletter, 58(25), 1982.
2. Faegri, K., Iverson, J., and Krzywinski, K., Textbook of Pollen Analysis, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York. 1989.
3. Horrocks, M., S.A. Coulson, and K.A.J. Walsh. Forensic palynology: variation in the pollen content of soil surface samples. *Journal of Forensic Sciences* 43(2):320-323, 1998.
4. Palenik, S., Microscopic trace evidence--the overlooked clue: Part II. Max Frei--Sherlock Holmes with a microscope, Microscope, 30, pp. 163-168, 1982.
5. Newman, C., Pollen: breath of life and sneezes, National Geographic Magazine, 166(4), pp. 490-521, 1984.

TABLE 2

TABLE 2